FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE MINOR RESEARCH PROJECT SUBMISSION AS PART OF ELEVENTH PLAN

UGC Letter No. F.5-207/2010-11 (MRP/NERO)/5237
dated 14th March 2011

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT

"AMIYO BHUSAN, THE MOUTHPIECE OF DISPLACED, DISTRESS HUMANITY" (ENGLISH)

"উদ্বাস্তু ঃ নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষ্যকার অমিয়ভূষণ" (বাংলা)

Submitted by

Dr. Arjun Chandra Debnath
Principal Investigator
Asstt. Professor, Deptt. of Bengali
Nabin Chandra College, Badarpur,
Karimganj, Assam - 788806

Submitted to

The Deputy Secretary
University Grants Commission
North Eastern Regional Office
Guwahati

13975
13997A
13975

NABIN CHANDRA COLLEGE
LIBRARY
BADARPUR : KARIMGANJ : ASSAM
Author: Submitted : Arjun Ch. Debnath
Title: উদ্বাস্তু : নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষ্যকার অমিয়ভূষণ

NABIN CHANDRA COLLEGE
LIBRARY
BADARPUR :: KARIMGANJ
1. Books may be retained for a period of not exceeding 15 days by Students
2. Books may be renewed on request at the discretion of the Librarian.
3. Dog-earing the pages of a book, marking or writing therein with ink or pencil, tearing or taking out its pages or otherwise damaging it will constitute an injury to a book.
4. Any such injury to a book is a serious offence; unless the borrower points out the injury at the time of borrowing the book he/she shall be required to replace the book or pay its price.

Call No. .... Acc. No. 13975
Date 01/12/15

FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE MINOR RESEARCH PROJECT SUBMISSION AS PART OF ELEVENTH PLAN

UGC Letter No. F.5-207/2010-11 (MRP/NERO)/5237
dated 14th March 2011

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT

"AMIYO BHUSAN, THE MOUTHPIECE OF DISPLACED, DISTRESS HUMANITY" (ENGLISH)

"UDVASTU " NISHANGA MANUSHER VASHYAKAR AMIYO BHUSAN" (BENGALI)

Submitted by

Dr. Arjun Chandra Debnath
Principal Investigator
Asstt. Professor, Deptt. of Bengali
Nabin Chandra College, Badarpur,
Karimganj, Assam - 788806

Submitted to

ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

The Deputy Secretary
University Grants Commission
North Eastern Regional Office
Guwahati

Fax & Phone: 03843-268153
Substitute Phone : 03843-267611
E-mail : n_ccollege@rediffmail.co

Office of the Principal & Secretary

NABINCHANDRA COLLEGE, BADARPUR

A Three Faculty College under UGC 2 (F) and 2 (B), Provincialised by the Govt. of Assam
Affiliated to Assam University, Silchar.
Re-Accredited by NAAC with Grade B (CGPA - 2.72)
Website : www.nccollege.org.in
P.O. : Badarpur - 788 806, Dist. : Karimganj, Assam (India)

From : **Dr. Mortuja Hussain,** M.A, PhD
Principal & Secretary
Mobile : + 91 - 9435177246

Ref. No. :

Date : 01/12/2015

CERTIFICATE

Certified that Dr. Arjun Chandra Debnath, Asstt. Prof., Department of Bengali, Nabinchandra College, Badarpur has complited his Minor Research Project under the title " AMIYO BHUSAN THE MOUTH PIECE OF DISPLACED DISTRESS HUMANITY" with financial assistance from University Grants Commission vide UGC Ref. No. F.5- 207/2010-11(MRP/ NERO)/ 5237 dated 14-3-2011.

I believe this original research work will provide important data for further research in this field.

1/12/15

(Dr. Mortuja Hussain)
Principal
Nabinchandra College, Badarpur,
Karimganj, Assam

Principal
NABINCHANDRA COLLEGE
P.O Badarpur, Dt Karimganj (Assam)

পটভূমি

বাস্তুভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। মানব জীবনে বাস্তুভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের কাছে গৃহ হল মনোরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। গৃহে শুধু আশ্রয়ই পায় না, গৃহী মানুষই সৃজন করে সংসার ও সমাজ। বসবাসের মধ্য দিয়েই সৃষ্ট হয় মানবীয় সম্পর্কাদি, পারিবারিক ও সামাজিক দায় দায়িত্ব, নৈতিকতা, বেঁচে থাকার জন্য সার্বিক মূল্যবোধ। অর্থাৎ বাসভূমির সঙ্গে মানুষের আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও বহুবিধ সম্পর্ক জড়িত। তাই দৈনন্দিন জীবনে যেমন, তেমনি মানুষের শিল্প সাহিত্যে ও বাস্তুভূমির গুরুত্ব স্বীকৃত।

গৃহজীবনের কথা সাহিত্যে বারবার আসে, নানা ভাবে আসে। কিন্তু গৃহজীবনের আশ্রয়টুকু যখন হারাতে হয় নিরুপায় হয়ে, আর একটি আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহহীন মানুষকে অসহায় ও উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, তখন বাস্তুচ্যুত মানুষের গৃহহারানোর বেদনা ও প্রতিকূল পরিবেশে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যা সর্বোপরি অনিকেত মানসিকতাকে মানবিক চেতনা সম্পন্ন ও সমাজ মনস্ক শিল্পী সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করতে পারেন না, শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো সাহিত্যেও তাই যেমন গৃহজীবনের কথা আছে, তেমনি আছে উদ্বাস্তু জীবন কথা। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী রচিত গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গৃহহীন জীবনের ভাষ্য তারই শিল্পরূপ আমার উক্ত গবেষণা সন্দর্ভ।

মূল বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে গবেষণা সন্দর্ভটিকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ঃ-- মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার নানাবিধ আঙ্গিক। উক্ত অধ্যায়টিকে তিনটি উপ-বিভাগে বিন্যস্ত করেছি (ক), (খ) ও (গ)। (ক) বিভাগে উপস্থাপন করেছি -- "উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা ও স্বরূপ", (খ) বিভাগে উপস্থাপন করেছি "ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত", (গ) বিভাগে উপস্থাপন করেছি "দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা"।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-- বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু। উক্ত অধ্যায়ের শিরোনামকে সামনে রেখে অধ্যায়টিকে বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষে রেখে মোট ছয়টি ভাগে বিন্যস্ত করেছি। (ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু জীবন। (খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু জীবন। (গ) বাংলা ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন। (ঘ) বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন। (ঙ) বাংলা নাটকে উদ্বাস্তু জীবন। (চ) নিঃসঙ্গতা ও বাংলা সাহিত্য।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ-- অমিয়ভূষণের উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ-- অমিয়ভূষণের ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন।

এছাড়াও উপসংহার অংশে "উদ্বাস্তু ঃ-- অমিয়ভূষণ" বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা যেমন উপস্থাপন করেছি, তেমনি "পরিশিষ্ট" অংশে অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যবহৃত রাভা, রাজবংশী ও পাবনা রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবহৃত উপভাষাগুলির প্রকৃত বাংলা শব্দ উল্লেখ করেছি।

তবে পরিশেষে বলার কথা যে আমার প্রতিটি অধ্যায় ও উপ-বিভাগগুলির বিষয় নির্বাচনে ও প্রতিবেদন তৈরিতে আমি দেশভাগ, পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের বিশেষ বিশেষ কিছু নির্বাচিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটককে যেমন বেছে নিয়েছি তেমনি বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বেছে নিয়েছি এই জন্যই যে উদ্বাস্তু জীবন সমস্যা ও তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি সেইসব রচনায় বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে বলেই। তবুও জানি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে অনেক মূল্যবান বিষয়ানুযায়ী পাঠকৃতি গবেষণা সন্দর্ভের বাহিরে থেকে গেছে, হয়তো সেইসব পাঠকৃতিকে নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভের পরিসরকে বাড়িয়ে নেওয়া যেত। এই অসম্পূর্ণতার জন্য খেদ থেকেই গেল। তবে যে সমস্ত পাঠকৃতি আলোচনায় উঠে এসেছে সেইসব পাঠকৃতির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি "উদ্বাস্তু জীবন" আলেখ্যকে, উদ্বাস্তু জীবনের ভাষ্যকে।

১ ডিসেম্বর
বদরপুর, করিমগঞ্জ

ড. অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ

গবেষকের নিবেদন

ইতিহাসের বিচারে উদ্বাস্তু সমস্যা এক পুরানো সমস্যা। অবশ্য বিশ্ব ইতিহাসে এ সমস্যা প্রথম ভয়াবহ রূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর-জার্মানীতে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে সমগ্র ভারত উপমহাদেশেই এ সমস্যার কালো মেঘ নেমে আসে। অর্থাৎ উদ্বাস্তু সমস্যা এ উপমহাদেশের জনজীবন, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। অতএব দেশ বিভাগ উত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই উদ্বাস্তু সমস্যা অল্প বিস্তর প্রাধান্য পেয়েছে। উদ্বাস্তু জীবন আশ্রয়ী বহু কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক রচিত হয়েছে, যেগুলি উদ্বাস্তু জীবনের সার্বিক দলিল হয়ে আছে। অথচ সেইসব কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে প্রতিফলিত উদ্বাস্তু জীবন ও জীবন সমস্যা কিংবা বাস্তবতা নিয়ে অথবা বলা চলে উদ্বাস্তু মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনদর্শন নিয়ে এ পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা বাংলা সাহিত্যে প্রায় হয়নি বললেই চলে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা অত্যন্ত জরুরী ছিল। সেই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই আমার গবেষণা সন্দর্ভ "উদ্বাস্তুঃ নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষ্যকার অমিয়ভূষণ"।

গবেষণা সম্পূর্ণকরণে সমস্ত আর্থিক অনুদান দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন University Grants Commission (N.E.R.O), Dispur, Guwahati, Assam, year 2010-11 তাদের প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা। এছাড়াও অন্যান্য যাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম তৎকালীন নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরুণ কুমার সেন, বর্তমান অধ্যক্ষ ড. মর্তুজা হোসেন, উপাধ্যক্ষ ড. মাহতাবুর রহমান, কলেজের বরিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. বিষ্ণু কুমার দে, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান অনন্ত পেগু। আরো যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, করিমগঞ্জ কলেজের গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ নগর কলেজের গ্রন্থাগার, হাইলাকান্দি এস.এস. কলেজের গ্রন্থাগার এবং নবীনচন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগার, প্রত্যেকের সময়োপযোগী সহযোগিতা ও হাইটেক গ্রাফিক সেন্টার, বদরপুরের কর্ণধার দেবব্রত চক্রবর্তীর পরিচ্ছন্ন মুদ্রণের ফলেই আমার পক্ষে গবেষণা সন্দর্ভটি সময়মতো সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ড. অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বদরপুর,
করিমগঞ্জ, আসাম।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ-- মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার নানাবিধ আঙ্গিক।		
(ক)	উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা ও স্বরূপ।	১ - ৩
(খ)	ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।	৪ - ৬
(গ)	দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা।	৬ - ২৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-- বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু।		
(ক)	প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু।	২৯ - ৩১
(খ)	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু ভাবনা।	৩২ - ৫৩
(গ)	বাংলা ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন।	৫৩ - ৬২
(ঘ)	বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু ভাবনা।	৬২ - ৭২
(ঙ)	বাংলা নাটকে উদ্বাস্তু জীবন।	৭২ - ৭৮
(চ)	নিঃসঙ্গতা ও বাংলা সাহিত্য।	৭৮ - ৮০
তৃতীয় অধ্যায় ঃ-- অমিয়ভূষণের উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন।		৮১ - ৯৪
চতুর্থ অধ্যায় ঃ-- অমিয়ভূষণের ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন।		৯৫ - ৯৮
উপসংহার ঃ-- উদ্বাস্তু ঃ অমিয়ভূষণ।		৯৯ - ১০১
অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা।		১০২ - ১১০
পরিশিষ্ট (অমিয়ভূষণের উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যবহৃত রাভা, রাজবংশী ও পাবনা - রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবহৃত উপভাষাগুলির প্রকৃত বাংলা শব্দ দেওয়া হল)		১১১ - ১২১
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পঞ্জি		১২২ - ১২৯

****

প্রথম অধ্যায়

মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার নানা আঙ্গিক

ক) উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ—

ইতিহাসের বিচারে উদ্বাস্তু সমস্যা এক পুরানো সমস্যা, অবশ্য বিশ্ব ইতিহাসে এ সমস্যা প্রথম ভয়াবহ রূপ নেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর জার্মানিতে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে সমগ্র উপমহাদেশেই এ সমস্যার প্রাবল্য আমরা লক্ষ্য করি। উদ্বাস্তু সমস্যা সে সময় এই উপমহাদেশের জনজীবন, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। দেশ বিভাগ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই উদ্বাস্তু সমস্যা অল্প বিস্তর প্রাধান্য পায়, উদ্বাস্তু জীবন আশ্রয়ী বহু গল্প, উপন্যাস রচিত হয়। গল্পের পরিসর যেহেতু সীমিত, উদ্বাস্তু-জীবনের খণ্ডাংশ তাতে প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে উদ্বাস্তু জীবনের সার্বিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব, ফলে উপন্যাস গুলি উদ্বাস্তু জীবনের দলিল হয়ে ওঠে।

মানব জীবনে বাস্তুভূমির গুরুত্ব অপরিসীম, মানুষের কাছে গৃহ হল মনোরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। গৃহে মানুষ শুধু আশ্রয়ই পায় না, গৃহী মানুষই সৃজন করে সংসার ও সমাজ, বসবাসের মধ্য দিয়েই সৃষ্ট হয় মানবীয় সম্পর্কাদি, পারিবারিক ও সামাজিক দায় দায়িত্ব। নৈতিকতা, বেঁচে থাকার জন্য সার্বিক মূল্যবোধ। বাসভূমির সঙ্গে মানুষের আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও বহুবিধ সম্পর্ক জড়িত, তাই দৈনন্দিন জীবনে যেমন, তেমনি মানুষের শিল্প সাহিত্যেও বাস্তুভূমির গুরুত্ব স্বীকৃত। এই গৃহজীবনের কথা সাহিত্যে ঘুরে ফিরেই আসে। কিন্তু সেই গৃহ জীবনের আশ্রয়টুকু যখন হারাতে হয় নিরুপায় হয়ে আর একটি আশ্রয়ের সন্ধানে গৃহহীন মানুষকে অসহায় ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, তখন বাস্তুচ্যুত মানুষের গৃহ হারানোর বেদনা ও প্রতিকূল পরিবেশে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে 'উদ্বাস্তু' রূপে পরিগণিত হয়। সর্বোপরি অনিকেত মানসিকতাকে মানবিক চেতনা সম্পন্ন ও সমাজ মনস্ক শিল্পী সাহিত্যিক উপেক্ষা করতে পারেন না। শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো সাহিত্যে তাই যেমন গৃহ জীবনের কথা আছে, তেমনি আছে উদ্বাস্তু জীবনের কথা, স্মরণীয় যে একমাত্র বাস্তুর অধিকারী মানুষই উদ্বাস্তু হয়।

আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকেই মানুষ গৃহ নির্মাণ বা বাস্তু অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবার গঠন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তেমনি গৃহচ্যুতি ও বাস্তুহীন হওয়াটাও আদিম মানুষের সময় থেকেই আরম্ভ হয়। স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছাকৃতভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষকে 'উদ্বাস্তু' বলা যেতে পারে। 'উদ্বাস্তু' শব্দটির অভিধানিক অর্থ

এরকম বাস্তুহীন, ভিটাচ্যুত, বাস্তুভিটাত্যক্ত, গৃহত্যাগে বাধ্য, বাস্তুভিটা হতে দূরীভূত প্রভৃতি। কিন্তু কি কারণে মানুষ উদ্বাস্তু হয় বাংলা অভিধানে তার উল্লেখ নেই। বরং ইংরাজি অভিধানগুলিতে তার উল্লেখ আছে, যেমন ---

(ক) "One who owing to religious persecution or political troubles, seeks refuge in a foreign country."[১]

(খ) "Person who has been forced to flee from danger, e.g. from floods, war, political persecution."[২]

(গ) "A person who flees for refuge or safety, esp. to a foreign country, as in time of war."[৩]

প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি) সামাজিক অনুশাসন বিধির কঠোরতা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং রাষ্ট্র অথবা রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাবর্গের স্বার্থের সংঘাতের ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে উদ্বাস্তুজীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে 'UNHCR' উদ্বাস্তুর যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তা সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ ----

A refugee, according to the 1951 statute of the office of the United nations High Commissioner on Refugee (UNHCR), is any person who, "owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a perticular social group of political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or owing ro such fear, in unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having of nationality and being outside the country of his former habitual residence, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it."[৪]

আসলে ব্যক্তি মানুষ কি কারণে, পরিবেশ এবং অবস্থায় ছিন্নমূল হয়ে পড়ে 'UNHCR'-এর বক্তব্যে তা পরিস্ফুট। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি (Notification No. 3370 Rehabilitation) থেকে উদ্বাস্তু মানুষের একটি সুন্দর সংজ্ঞা বেরিয়ে এসেছে। তা নিম্নরূপ ----- Refugees means a person who was migrated into West Bangal for reasons of safety in apprehension of disturbances endangering person or property in his usual place of residence in eastern Pakistan.

(৩)

তবে উল্লেখর বিষয় যে 'রিফিউজি' শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ আছে। একটা হল 'শরণার্থী', যার আক্ষরিক অর্থ এমন কোনও ব্যক্তি যিনি কোনও উর্ধবতন শক্তির শরণ নিয়েছেন, অর্থাৎ আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছেন। অন্য প্রতিশব্দটি তহল 'উদ্বাস্তু', যার মানে গৃহহীন, একটা বিশেষ অর্থে গৃহহীন। কারণ বৈদিক ঐতিহ্যে সংস্কৃত বাস্তু (বাড়ি) শব্দটির একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। 'বাস্তু' শব্দের সংজ্ঞা হিসেবে মনিয়র উইলিয়াম অন্য আরও নানা কিছুর সঙ্গে জানাচ্ছেন, "দ্য সাইট অর ফাউণ্ডেশন অব আ হাউস"।[২] বাংলায় এই শব্দটিকে প্রায়ই 'ভিটা' শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই ভিটার সঙ্গে আবার সংস্কৃত 'ভিত্তি' শব্দটির সম্পর্ক আছে। এই 'ভিত' বা 'ফাউণ্ডেশন' এর সঙ্গে আবার পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ পুরুযানুক্রমিক বংশধারার একটা সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ 'বাস্তুভিটা' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থায়ী বাড়ির সম্পর্ক।

আবার অস্থায়ী আবাস এবং স্থায়ী গৃহের মধ্যে যে তফাৎ তা মূলত ধরা পড়ে বাংলা ভাষার দুটি আলাদা শব্দে 'বাসা' এবং 'বাড়ি'। 'বাসা' সব সময়েই অস্থায়ী ঠিকানা, তা সেখানে কেউ যতদিনই বাস করুক না কেন। অন্যদিকে 'বাড়ি' হল সেই জায়গা যেখানে কারও পূর্বপুরুষ দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছে। যেমন, কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুরা প্রায়শই তাদের বাড়ি কোথায় জানাতে গিয়ে গ্রামের ভিটেবাড়ির কথাই বলে। এমনকি তাদের 'বাসা' যদি কলকাতার ঠিকানায় হয়, তখনও 'বাড়ি' বলতে সেই ভিটেকেই বোঝানোর চেষ্টা করে। এখানে মনে রাখা দরকার বাংলায় বাড়ি-র আর একটি প্রতিশব্দ হল 'দেশ'। যার অর্থ কারও নিজস্ব ভূমি, নিজের দেশ।

পরিশেষে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক য়ে -- 'উদ্বাস্তু' কাকে বলব ? 'উৎ' উপসর্গ যোগে উৎখাত হওয়া বা সরিয়ে দেওয়া, কোন নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে চলে যাওয়ার একটা অর্থ তৈরী হয়। অর্থাৎ, 'উদ্বাস্তু' তিনিই, যাকে তার ভিটে থেকে, ভিত্তিভূমি থেকে, বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ, দুর্ভাগ্যজনক কোন কারণ ছাড়া এমনটা হতে পারে না। কেন না মানুষ জন্মের পর জন্ম ধরে নিজের বাস্তুভিটা, ভিত্তিভূমি বা বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারাকে গৌরবের বা সৌভাগ্য বলে মনে করে। যদিও পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ, শাসক গোষ্ঠীর সুবিচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ সংগ্রামের সুফল না পেলে মানুষকে ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হতেই হয়।

(খ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ঃ—

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বাস্তু হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। তবে ঠিক কবে, কোথায়, কিভাবে মানুষ প্রথম উদ্বাস্তু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত, ইউরোপে রোমের পতনের ফলে বহু মানুষ গৃহহারা, নিঃসঙ্গ হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পর আর্য-অনার্যের সংঘর্ষের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী দ্রাবিড় ভাষাজাত সম্প্রদায়কে দাক্ষিণাত্য ও পূর্বভারতের বিভিন্ন বনে জঙ্গলে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। এরাই বোধ হয় এই উপমহাদেশের আদিম উদ্বাস্তু। অনার্যদের মতো চীনের ইউ-চি জাতিও একই কারণে উদ্বাস্তু হয়। আবার প্রাচীনকালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বারেবারে সংঘর্ষ ও লড়াইয়ের ফলে পরাভূত সম্প্রদায় বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় --------- "জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগকে দেশ অধিকৃত করিয়া, আদিবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পালাইয়া বাস করে। টিউটনগন কর্তৃক ব্রিটন জয়ের ফল এই রূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন জয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসীদিগের নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েলস, কর্ণওয়াল বা ব্রিটানি প্রদেশে গিয়ে পালাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল।"[৬]

অন্যদিকে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়েছে যেমন মানুষ, তেমনি ধর্মীয় কারণেও কোন কোন সম্প্রদায় উদ্বাস্তু হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টানদের নিপীড়ণে ইহুদীরা ক্যাথলিক অধ্যুষিত দেশ থেকে সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্টরা এবং প্রোটেস্ট্যান্ট প্রধান দেশ থেকে ক্যাথলিকরা গৃহহারা হয়েছে ধর্মীয় বিভেদের ফলেই। এছাড়া বর্গী আক্রমণের (১৭৪২-১৭৫১) ফলে বাংলাদেশের প্রধানত রাঢ় বাংলায় বহু লোকের বাস্তুচ্যুতি ঘটে।

জাতি ধর্ম-ভাষাগত বিদ্বেষ, ক্ষমতার লোভ ও পররাষ্ট্রের প্রতি আগ্রাসন নীতি, দেশ বিভাজন, শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধিতা প্রভৃতি বহু বিচিত্র জটিল কারণে অসংখ্য মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে। তথ্যানুযায়ী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনীদের প্যালেস্টাইন থেকে উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্র ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠিত হলে কম পক্ষে ৪১৯০০ লোক দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও বিভাগজনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ৮০ লক্ষ মানুষ ভারত থেকে পাকিস্তান এবং ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। এভাবে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ১৮,১৭৩০১১ মানুষ উদ্বাস্তু তালিকাভুক্ত হয়েছে। পরিসংখ্যান -- (The new Encyclopaedia Britannican vol-15, Ed-15, 1981, P-568) তবে

উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের দেশ এমন কি সারা বিশ্ব মানব সমাজের জলন্ত সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৪৬ খ্রীঃ গঠিত হয় International Refugee Organisation (I.R.O) এর চার বছর পর ১৯৫০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় office of the United Nations High Commissioner on Refugee (UNHCR)। উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদেশগুলির আর্থিক সহায়তায় এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি উদ্বাস্তু তথা নিঃসঙ্গ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

স্মরণীয় যে, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মবিদ্বেষী বর্মণ বংশের শাসনকালে (১০৭৫-১১৫০ খ্রীঃ) ও সেন বংশের শাসনকালে (১১৬০-১২০২ খ্রীঃ) বৌদ্ধ আচার্যগণ বাস্তু ত্যাগ করে বাংলার বাইরে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে আশ্রয় নেয়। রাজশক্তির পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও নিপীড়নই সেদিন বৌদ্ধ আচার্যদের গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। অবশ্য বৌদ্ধদের প্রতি শুধু রাজশক্তি নয়, সাধারণ মানুষ ও বিদ্বিষ্ট ছিল। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রবাসী রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে তাঁকে দেশত্যাগ করে সিংহলে যাত্রা করতে হয়। আবার মুসলমান শাসনে হিন্দুরাও অত্যাচারিত হয়ে বাস্তুত্যাগ করেছে। খিলজী বংশের আমলে (১২০৬-১২২৭ খ্রীঃ) উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান প্রভাবিত অঞ্চল পরিত্যাগ করে মিথিলা, উড়িষ্যা, নেপাল ও কামরূপের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে যায়।

আধুনিক বিশ্বে নিম্নলিখিতভাবে মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরা যায় ---

(১) যুদ্ধের সময় অগ্রসরমান বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল থেকে নিরাপত্তার কারণে মানুষ দেশত্যাগ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীঃ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রীঃ) এবং চীন-জাপান যুদ্ধের সময় (১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রীঃ) সময় সৈন্যদের উপস্থিতি যা উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ গৃহত্যাগ করে। অবশ্য যুদ্ধশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে অধিকাংশ মানুষই গৃহে ফিরে আসে। সাময়িকভাবে এদের উদ্বাস্তু বলা যায়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানী (পূর্বাঞ্চল থেকে ৫ লক্ষ মানুষ আতঙ্কে পশ্চিমে চলে আসে)।[৭]

(২) রাজনৈতিক মত পার্থক্যের জন্যও বহু মানুষ দেশ থেকে বহিষ্কৃত অথবা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে মানুষ বাস্তু হারিয়েছে। রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) এবং বিপ্লবোত্তর কালে (১৯১৭-২১ খ্রীঃ) রাজনৈতিক কারণ ১,৫০,০০০ মানুষ দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়েছে।[৮] সেই সঙ্গে ভিয়েৎনাম, কম্পুচিয়া ও লাওসে প্রায় ২০ লক্ষ এবং উগাণ্ডায় ৪,০০,০০০ মানুষ একই কারণে উদ্বাস্তু হয়েছে।[৯]

(৩) ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষের ফলে আধুনিক পৃথিবীতে বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। ইহুদী বিদ্বেষের কারণে ১৯০০ খ্রীঃ জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া থেকে ৪ লক্ষ ইহুদী বিতাড়িত হয়, এবং স্পেন থেকে বিতাড়িত হয় ১,৫০,০০০ ইহুদী। [১০] এছাড়া শ্বেতাঙ্গ শাসকের অত্যাচারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে।

(৪) দেশবিভাগ ও সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে (জার্মানী, ভারত, পাকিস্তান ও প্যালেস্টাইন) অগণিত মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে (পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী) বসবাসরত ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২০ লক্ষ ছাড়া বাকী সবাই জার্মানীতে আশ্রয় নেয়। [১১] পরে অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে এদের হস্তান্তরিত করা হয়।

এইভাবে ১৯৪৮ খ্রীঃ ফিলিস্তিনীদের প্যালেস্টাইন থেকে উচ্ছেদ করে নতুন রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ স্বজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৭১ খ্রীঃ ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হলে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। প্রথমটিতে ১ থেকে ২ মিলিয়ন, দ্বিতীয়টিতে ৮০ লক্ষ, তৃতীয়টিতে ১০ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। এছাড়াও বিদেশী শাসনের ফলেও মানুষ জন্মভূমি ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়েছে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ থেকে একারণে ১০ লক্ষ মানুষ এবং আফগানিস্তান থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ গৃহত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। [১২] এভাবে ১৯৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ৮০টি দেশের সর্বমোট ১৮,১৭৩,০১১ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। [১৩]

(গ) দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ঃ—

১৯৪৭ খ্রীঃ ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ভারতীয় উপমহাদেশের যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল, তা একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে খণ্ডিত, ট্র্যাজিকও বটে। কারণ একটি নয় দুটি দেশ জন্মগ্রহণ করেছিল। সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর গড়ে উঠেছিল দুটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এতেও হয়তো তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বিভাজন হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ আর বিদ্বেষের ভিত্তিতে। স্বাধীনতার ঠিক আগে ও পরে দেশের নানা স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়ে, বহু মানুষ ছিন্নমূল, গৃহহারা হয়েছে। নতুন মানচিত্র টানা হয়েছে রক্তের রেখায়। সেই (দেশভাগ) যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তা আজও দূর হয়নি। অর্থাৎ 'উদ্বাস্তু' সমস্যা।

'উদ্বাস্তু' সমস্যার সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগ প্রসঙ্গ। দেশভাগের ফলেই মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। উল্লেখ্য যে আবহমানকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাসস্থান ভারতবর্ষ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে এক সম্প্রদায়ের মানুষের বিভিন্ন অসন্তোষকে কৌশলে ব্যবহার করে দেশভাগের পথ সুগম করেছে। ভারতবর্ষে সে সময় দুটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন হল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের অভিষ্ট ছিল খণ্ডিত ভারত। তারা চেয়েছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের কথা বললেও দেশভাগকে আটকাতে পারেনি বরং দেশবিভাগকে সম্মত জানায়। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদকে কাজে লাগিয়ে ভারত বিভাগকে সুনিশ্চিত করে।

উল্লেখের বিষয় যে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রধানত আর্থিক ও অন্যান্য বৈষম্যের ফলে খুব ধীরে হলেও দূরত্ব বাড়তে থাকে ব্রিটিশ আগমনের ফলেই। কেননা ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থা তেমন খারাপ ছিল না। প্রশাসন, সেনা ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ স্থান ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের গুরুত্ব কমে এসেছে। তার মধ্যে ১৮৩১ খ্রীঃ ভারতবর্ষে ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেলে স্বধর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে, কিংবা দারিদ্র্যতার জন্য মুসলমানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে সরকারি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। আর মুসলমানদের অধিকাংশই কৃষিকাজে, ছোট ছোট কাজে লিপ্ত ছিল। ফলে হিন্দুদের সার্বিক অগ্রগতি সেসময় মুসলমানদের কাছে বঞ্চনা বলে মনে হওয়ার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে। যা শেষ পর্যন্ত দেশভাগের মধ্য দিয়ে দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে উঠে।

উপরিউক্ত বিষয়টিকে গৌণ হিসেবে ধরে নিয়ে চিন্তাবিদদের ধারণা প্রধানত ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। এর কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রীঃ) ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪ খ্রীঃ) প্রবর্তিত হিন্দুমেলা (১৮৬৭ খ্রীঃ), দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রীঃ) আর্যসমাজ (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা এবং আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন (যার উদ্দেশ্য ছিল অ-হিন্দুদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করা), বালগঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০ খ্রীঃ) গণেশপূজা (১৮৯৫ খ্রীঃ) ও শিবাজী উৎসব (১৮৯৫ খ্রীঃ) প্রচার, স্বদেশ আন্দোলনে গীতার বাণী ও 'বন্দেমাতরম' (১৮৭৫/৭৬ খ্রীঃ) সঙ্গীতের ব্যবহার মুসলমানেরা মেনে নিতে পারেনি। পরিবর্তে মুসলমানেরা 'তবলীগ' ও 'তানযীম' আন্দোলন শুরু করে। আবার (১৮১৮-১৮৭১ খ্রীঃ) 'ওয়াহাবি আন্দোলন' ও (১৮১৮-১৯৪৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশের 'ফরাসী আন্দোলন' মুসলমান সম্প্রদায়কে সনাতন ইসলাম ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছেন। যদিও পরবর্তীতে

এইসব আন্দোলনগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে --- "জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাসী ও ওয়াহাবিরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গো-হত্যা করে, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করে ও হিন্দু গ্রাম লুট করে।" [১৪] আবার সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ি করে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লেখেন -------- "......... এই দুষ্ক্রিয়াকারকগণ (সিপাহীরা) গভর্ণমেন্টের প্রধান শত্রু, তন্মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক।" [১৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮৪ খ্রীঃ) যবনদের বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবহার করেছেন। 'বসুমতী' পত্রিকায় লেখা হয়েছে "যদি স্বরাজ অর্জিত হয় তবে যে হিন্দু স্বরাজই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?"[১৬] মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের কটূক্তি ও তাচ্ছিল্যভাব থেকেই মুসলমানদের মনে জন্ম নেয় বিদ্বেষ ও হিংসা। ফলত ভারতীয় মুসলমানরাও নিজেদের ভারতীয় বলতে অস্বীকার করতো। ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের সুতীব্র মোহ জন্ম নিল। তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা Pan-Islamism-এ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংখ্যালঘু মানসিকতা উদ্ভূত হতাশা ও ভীতি। যার প্রকাশ ঘটেছে ১৯২৬ খ্রীঃ প্রকাশিত 'মোসলেম দর্পণ' পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ---- "সরকারী সাহায্য না থাকলে ২৩ কোটি হিন্দু ৭ কোটি মুসলমানকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে।" [১৭] মূল কথা আর্থিক বৈষম্য, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ, হিন্দুদের শীতল উদাসীন্য এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা জনিত ভীতি ও অনিশ্চয়তা উভয় সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ---- "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।" [১৮]

স্মরণীয় সৈয়দ আহমেদ খান ১৮৮৮ খ্রীঃ উল্লেখ করেছেন হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। সুতরাং তাদের পক্ষে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে -- It is possible the under these circumstances two nations the Mohammadan and Hindu could sit on the same throne and remain equal in power. [১৯]। এর সূত্র ধরেই সম্ভবত ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকায় আত্মপ্রকাশ করে 'মুসলীম লিগ'। এরপর ১৯৩০ খ্রীঃ এলাহাবাদের মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল ঘোষণা করেন --- "Muslim India constituted a nation by itself"। [২০] ইকবালের এই উক্তি থেকে ভারতের মধ্যে মুসলমানরা একটি মুসলিম ভারতের কথা চিন্তা করতে থাকেন। পরবর্তীতে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য পাঞ্জাব, আফগানিয়া, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে মুসলিমরা জানিয়েছেন ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে আলাদা বলেই তাদের এই দাবী।

১৯৪০ খ্রীঃ ২২শে মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন শুরু হয়। মহম্মদ আলী জিন্নার সভাপতিত্বে প্রকাশ্য অধিবেশনে ফজলুল হক মূল প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবটি

নিম্নরূপ ---- "Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country o acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle. viz. that geographically contiguous units are democrated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units shall be autonomus and soverign ...... ।" [১১]

এই প্রস্তাবেই সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করে ভারতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারত ভাগের সম্মত আদায় করে নেয়।

পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে নিজেদের স্বার্থে বিকাশ ও পুষ্টি দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। কেননা ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িকতাকে উপস্থাপিত করেছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচ হিসেবে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ১৯৪২ খ্রীঃ জিন্না সাহেব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দেন, সংখ্যানুপাতিক ভোটগ্রহণ বা সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কোন কিছুতেই তাঁর সমর্থন নেই। তিনি চান মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি। পক্ষান্তরে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে ১৯৪৫ খ্রীঃ লেবার পার্টি জয়লাভ করলে ক্লীমেন্ট রিচার্ড এটলি প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠে। ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ এটলি কমন্স সভায় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য গঠন করেন 'ক্যাবিনেট মিশন'। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করলে মুসলিম লীগ প্রথমে তা সমর্থন করলেও পরবর্তীতে সরকারে যোগ দিতে অসম্মত হয়। বরং ১৬ই আগস্ট জিন্না সাহেব মুসলমানদের Direct Action পালনের আহ্বান জানান। ফলস্বরূপ সমস্ত ভারত জুড়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা প্রথমে কলকাতায় শুরু হয়। পরে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের (লাহোর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, অমৃতসর ও গুরুদাসপুর) সর্বত্র ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ বলতে শুরু করে একমাত্র ভারত দ্বিখণ্ডীকরণের মাধ্যমেই এর সমাধান হতে পারে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে গভর্ণর জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। ২রা জুন ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ব্যাটেন সাহেব ভারতীয় নেতৃবৃন্দ (জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মহম্মদ আলি জিন্না, আবদুর রব নিশতার, লিয়াকত আলি খান ও বলদেব সিংয়ের) সঙ্গে মিলিত হন। বৈঠকে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে ৩রা জুন ব্যাটেন সাহের দেশবাসীকে সেই সিদ্ধান্তের কথা জানান। ৯ই জুন মুসলিম লীগ এবং ১৪ জুন অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস সমিতি ভারত ভাগের

প্রস্তাবটিতে অনুমোদন জানায়। অর্থাৎ ১৪ই জুন স্থির হয়েছে ভারত দ্বিখণ্ডিত হচ্ছেই।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী, কংগ্রেস নেতাদের ব্যর্থতার ফলস্বরূপই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ক্রমবর্ধমান দাঙ্গা, শাসক বিরোধী কার্যকলাপ, ব্রিটিশ সরকারের নমনীয় মনোভাব প্রভৃতি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন হয়। ১৮ই জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে আইনটি রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। সেই সঙ্গে ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঘোষণা করা হয়। এইভাবেই জন্ম নিল দুটি পৃথক রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, শ্রীহট্ট এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান এবং পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে গঠিত হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৪ই আগস্ট মাঝরাতে মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় গণ পরিষদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হল এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল।

দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক হিন্দু প্রাণ, মান ও সম্ভ্রম বাঁচাতে গৃহত্যাগ (বাস্তুভিটা) করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। পাঞ্জাবে অবশ্য স্বাধীনতার পরেই বেশীর ভাগ মানুষ গৃহত্যাগ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে --- "দিল্লীর দিকে, লাহোরের দিকে, দুই বিপরীত মুখে, ধেয়ে চলল লাখ লাখ উদ্বাস্তুর প্রবাহ।"[২২] আসলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যারা নিজেদের আত্মমর্যাদা এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাঁরাই ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা দেখে দেশত্যাগ করে 'উদ্বাস্তু' শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৪৮-৪৯ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০,০০০ উদ্বাস্তু বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় শিবির ছাড়াও বহু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫০ খ্রীঃ সবচেয়ে বেশী মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছে। কারণ পূর্ববঙ্গে সে সময় সংগঠিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সময়পর্বে যারা উদ্বাস্তু হয়েছে তারা সবাই ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিরোধী নীতির শিকার। কেননা পাকিস্তান শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলাকে ও মুসলমান রাজ্যে পরিণত করা। ফলস্বরূপ পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িদখল, নারী হরণ, ধর্মান্তরিতকরণ এবং নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়। সংখ্যালঘু বিপন্ন মানুষ দলে দলে পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, জলপথে পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তু শিবিরে নাম নথিভুক্ত করেছে। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট জিন্না পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে --- "আপনারা যে কোন ধর্ম বা জাত বা

বিশ্বাসের অনুগামী হতে পারেন - তার সঙ্গে রাষ্ট্রের কাজের কোন সম্পর্ক নেই ...... আমরা এই মৌলিক নীতি থেকে আরম্ভ করছি যে আমরা সবাই একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, এবং সমান নাগরিক ......।" [২৩] কিন্তু জিন্না সাহেবের এই প্রতিশ্রুতি শাসক গোষ্ঠী যে মান্য করেনি তার প্রমাণ ১৯৫০ খ্রীঃ ভয়াবহ দাঙ্গা। এই দাঙ্গা সম্পর্কে বলা হয়েছে ---- "মীরপুর ও মহম্মাদপুরে এবং নারায়ণগঞ্জ ও খুলনার খালিশপুরে এবং রংপুরে বিহারী গুণ্ডাদের পাকিস্তান সরকার টাকা, মদ ও অস্ত্র দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত রাখত।" [২৪]

তবে উল্লেখের বিষয় যে দেশভাগের পর অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্য সংকটের ফলেও অনেক মানুষ পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। তার মধ্যে ১৯৫২ খ্রীঃ পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, এই ভেবে যে এরপর আর ইচ্ছামত ভারতে যাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কায় সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৫২ খ্রীঃ প্রায় ১২৭০০০ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ১৯৫৪ খ্রীঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে সংখ্যালঘুরা দাঙ্গার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গের দিকে পা বাড়ায়। পরবর্তীতে ১৯৬৫ খ্রীঃ পূর্ববঙ্গে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে --- "পূর্ব পাকিস্তানে কম করে এক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে ...... কম করে দশহাজার হিন্দু গৃহহীন হয়েছে। ঢাকার চারপাশে গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত, ভস্মীভূত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে।" [২৫] ফলে আবারও পূর্ব পাকিস্তানের গৃহহীন সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা কেন উদ্বাস্তু হয়ে প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে ? এর উত্তর - পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা জানত, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হলেও পশ্চিমবঙ্গে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, ভাষাও অভিন্ন। ফলে তাদের নিরাপত্তার কোন অভাব হবেনা। এছাড়াও দেশভাগের সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে ---- "কল্পিতভাবে বা বাস্তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে সব হিন্দু পাকিস্তানে তাদের নিজের গৃহে থাকতে পারবে না ..... সে ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কিত প্রদেশের নিশ্চিত কর্তব্য এসব উদ্বাস্তুদের দুহাত তুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ সুবিধা দেওয়া, তাদের অনুভব করতে হবে যে তারা অপরিচিত দেশে আসেনি।" [২৬] এছাড়াও জহরলাল নেহরু উদ্বাস্তুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই বলে যে ---- "পূর্ববঙ্গে যারা বিপন্ন হবে, তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য হবে তাদের নিজেদের দেশেই তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা, আর যদি অন্য উপায় না থাকে এবং বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমাদের নিজের দেশেই তাদের আশ্রয় দেওয়া। পূর্ব পাকিস্তানে যারা সংখ্যালঘু তারা নিশ্চিত আমাদের দায় ......।" [২৭] এই সমস্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার আগে ও পরে উদ্বাস্তুর ঢল নামে।

১৯৫১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু মানুষের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে কমলেন্দু ধর 'স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ' গ্রন্থে জেলা ভিত্তিক যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ ঃ---

জেলা	উদ্বাস্তুর সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যার শতাংশ
কলকাতা	৪৩৩২২৪	১৭.০০
২৪ পরগনা	৫২৭২৬২	১১.৪৪
নদীয়া	৪২৬৯০৭	৩৭.২৯
মুর্শিদাবাদ	৫৮৭২৯	৩.৪২
হাওড়া	৬১০৯৬	৩.৭৯
হুগলী	৫১১৫৩	৩.২৯
মেদিনীপুর	৩৩৫৭৯	১.০০
বর্ধমান	৯৬১০৫	৪.৩৯
বাঁকুড়া	৯২৯৫	.৭০
পঃ দিনাজপুর	১১৫৫১০	১৬.০৩
মালদহ	৬০১৯৮	৬.৪২
জলপাইগুড়ি	৯৮৫৭২	১০.৭৮
কুচবিহার	৯৯৯১৭	১৪.৯৮
দার্জিলিং	১৫৭৩৮	৩.৫৩

পরিসংখ্যান মতে সে সময় পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৭.৪৬ শতাংশই ছিল উদ্বাস্তু।" [২৮]

তবে বলার কথা যে শুধু ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গৃহহীন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে তা নয়। ১৯৭০-৭১ খ্রীঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের তথ্যানুযায়ী ১৯৪৬-৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত উদ্বাস্তু আগমনের হার নিম্নরূপ ---

১৯৪৬-৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত -- ২০,৪২,০০০ জন।

১৯৫১-৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত -- ১১,৩০,০০০ জন।

১৯৬১-৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত -- ১০,৩৭,০০০ জন।

১৯৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত সর্বমোট - ৪২,০৯,০০০ জন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১৩.৫৪ শতাংশই উদ্বাস্তু মানুষ।" [৫৯]

১৯৬১ খ্রীঃ জনগণনার প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু বসবাসের চিত্র নিম্নরূপ ঃ----

জেলা	মোট জনসংখ্যা	গ্রামীণ	শহুরে
পশ্চিমবঙ্গ	৩০৬৮৭৫০	১৫০৭২২০	১৫৬১৫৩০
"২৪ পরগনা	৭৮৬৬৬১	২৯৭১৬৪	৪৮৯৬৯৭
কলকাতা	৫২৮২০৫	৫২৮২০৫	
নদীয়া	৫০২৬৪৬	৩৮১০০৯	১২১৬৩৮
কুচবিহার	২৫২৭৫৩	২২৭৬২৮	২৫১২৫
জলপাইগুড়ি	২১৮৩৪১	১৭১৬১৭	৪৬৭২৪
পঃ দিনাজপুর	১৭২২৩৭	১২৫১৫৫	৪৭০৮২
বর্ধমান	১৪৪৭০৪	৮১৮৪১	৬২৮৬৩
হুগলি	১৩০৯৫১	৩৮৬৬৩	৯২২৮৮।।" [৬০]

এই পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শহর ঘেঁযা উদ্বাস্তুদের বসবাসের প্রাধান্য। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়নের উপর। বিভিন্ন জেলায়, নতুন 'টাউন' গড়ে উঠল। কলকাতা মহানগরের চরিত্র বদলে গেল। উত্তরের দমদম থেকে দক্ষিণের যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা থেকে সোনারপুর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ আধা-গ্রামীণ পল্লী অঞ্চল রাতারাতি শহরতলিতে পরিণত হল।

১৯৫১ খ্রীঃ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু নাগরিকের সংখ্যা কিভাবে ধাপে ধাপে বেড়েছে তা নিম্নরূপ ---

বছর	পঃবঙ্গে মোট শহরের জনসংখ্যা	শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরের জনসংখ্যার তুলনায় শহরের উদ্বাস্তু জনসংখ্যার শতকরা হার
"১৯৫১	৬২৮১৬৪২	১০৫২১২১	১৬.৭৪
১৯৬১	৮৫৪০৮৪২	১৫৬১৫৩০	১৮.২৮
১৯৭১	১০৯৬৭০৩৩	২৭২৪৯৩৬	২৪.৮৪।।" [৬১]

তবে সুখের কথা যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই সম্ভবত ব্যাপকতর নগরস্ফীতি, আজকের কলকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করতে সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অন্যতম উদ্বাস্তু সংগঠক অনিল সিংহ ১৯৭১-এর তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বা শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত যে উদ্বাস্তু পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ---

জেলা	উদ্বাস্তু সংখ্যা
"চব্বিশ পরগনা (উত্তর-দক্ষিণ)	১৬,৫০,০০০
নদীয়া	১৫,০০,৭৫০
কলকাতা	৯,০০,০০০
কুচবিহার	৪,৪২,০০০
পশ্চিম দিনাজপুর (উত্তর-দক্ষিণ)	২,৯২,৫০০
জলপাইগুড়ি	২,৪৯,০০০
বর্ধমান	২,৪০,০০০
বাঁকুড়া	১৪,১৫,৭৫০
হুগলি	১,৫৯,০০০
হাওড়া	১,৪৪,০০০
মালদহ	১,২৭,৫০০
মেদিনীপুর	৬৩,০০০
দার্জিলিং	৪৮,০০০
বীরভূম	৩,১৫,০০০
পুরুলিয়া	৯৭৫
মুর্শিদাবাদ	১,৩৫,০০০
	মোট ৫৯,৯৯,৪৭৫ ।"[৩২]

এ প্রসঙ্গে বলার কথা যে ১৯৭১ খ্রীঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ (১২০০০০০০) শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু সংখ্যক মানুষ সে দেশে ফিরে গেলেও মুজিবুর রহমানের হত্যার পর পুনরায় আরো কিছু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে বসবাস শুরু করেছে। এছাড়াও ১৯৮১ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত আর.আর. কমিটির রিপোর্টে রাজ্যে

আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তু দেখানো হয়েছে ৮০ লক্ষ। আবার ১৯৯১ খ্রীঃ জনগননার তথ্য মতে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়িয়ে ৯৬ লক্ষ। যদিও ১৯৭১ খ্রীঃ পরে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হয়নি এখনো তা ধীরগতিতে হলেও সচল একথা বলাই চলে।

পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্ত পরিসংখ্যান মেনে নিয়েও আমরা যদি নিতান্তই সহজলভ্য, সরকারি উদ্যোগ, ১৯৫১ খ্রীঃ থেকে ১৯৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত মুখ্যত জনগননার তথ্যের দিকে একটু তাকাই তা হলে ২০ বৎসরের উদ্বাস্তু আগমনের শতাংশ দাঁড়ায় নিম্নরূপ ----

বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু	উদ্বাস্তুদের শতকরা হার
"১৯৫১	২৬২৯৯৯৮০	২১০৪২৪১	৮
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮
১৯৭১	৪৪৩১২০১১	৪২৯৩০০০	৯.৬৮।।" [৩৩]

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে ৭০,০০০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুকে প্রথম অবস্থায় ধুবুলিয়া ক্যাম্পে এবং ৫০,০০০ হাজার উদ্বাস্তুকে কুপার্স ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও পঙ্গু তাদের **Permanent Liability Camp (PL Camp)** এ এবং যে সব পরিবারের মহিলারাই অভিভাবক তাদের সন্তান সহ আশ্রয় দেওয়া হয়েছে টিটাগড় ও রানাঘাটের আশ্রয় শিবিরে। পরবর্তীতে এই সব ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তুদের বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যান্য রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। এইভাবে ১৯৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৫৭,৫৪৪ জন উদ্বাস্তুকে বিভিন্ন শিবিরে স্থান দেওয়ার পর ৪,০৮,৫৫০ জনকে পুনর্বাসন স্থানে পাঠানো হয়। তথ্য মতে ১৯৫৮ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে ১২৬টি ট্র্যানসিট ক্যাম্পে মোট ৪৪,৮০৯ টি পরিবারের ১,৮৮,৩৮৬ জন উদ্বাস্তু এবং ২৬টি **PL Camp**-এ ১৭,৯৭২ পরিবারের ৫২,২৯৬ জন উদ্বাস্তু বসবাস করতো। [৩৪]

পরবর্তী পর্বে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার পতিত অথবা ফাঁকা জমিতে কলোনি স্থাপন করে সাধারণ কৃষিজীবি ও অকৃষিজীবি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ কলোনির সংখ্যা ও উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ----

"(ক) শহরাঞ্চলে স্থাপিত কলোনির সংখ্যা - ১৬৬, উদ্বাস্তু জনতার সংখ্যা - ১,৫৪,৮৬৫।

(খ) গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবিদের জন্য কলোনির সংখ্যা - ১৪৭, উদ্বাস্তু জনতার সংখ্যা - ৪৭,১৭০।

(গ) গ্রামাঞ্চলে অকৃষিজীবিদের জন্য কলোনির সংখ্যা - ৭৬, উদ্বাস্তুদের জনতার সংখ্যা - ৪১,৭৩০।"[৩৫]

এরমধ্যে বেশ কিছু উদ্বাস্তু সরকারের উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই পতিত জমিতে কলোনি গড়ে তোলে। কলকাতায় সে সময় ১৩৩ টি কলোনি গড়ে উঠলে প্রায় ২১,৩৭৭ টি পরিবার সেই কলোনিগুলিতে বসবাস করে। এছাড়া যতীন দাস, নেতাজী নগর, বিজয়গড়ের বিভিন্ন কলোনিতে প্রায় ১৩,০০০ টি পরিবার আশ্রয় নেয়।[৩৬]

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে ৫০,০০০, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরায় ২৫,০০০ করে উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল। এছাড়া ১৯৪৯ খ্রীঃ ২০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার অঞ্চলে এবং ১৯৫০ খ্রীঃ ১০২ টি পরিবারকে পোর্টব্লেয়ারে (দক্ষিণ আন্দামানে) এবং ১৯৫১ খ্রীঃ মধ্য আন্দামানের অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চলে ৩৮৪ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান বা কৃষিকাজের জন্য কলকাতা থেকে কোদাল, কাস্তে, শাবল, শস্যবীজ, জামা-কাপড়, বাসনপত্র যেমন সরবরাহ করা হয়েছে তেমনি তাদের আনন্দ উৎসবের জন্য খোল, করতাল, বাঁশি, ঘন্টা পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ সরকার তরাই অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য করার লক্ষ্যে ১,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে নৈনিতাল জেলার কিচ্ছা গ্রামে আশ্রয় দেয়।[৩৭]

উল্লেখের বিষয় যে, ১৯৫২ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব কে.পি. মাথরানি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নির্মলকান্তি রায়চৌধুরী এবং Indian Statistical Institute-এর পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ এস.বি. সেনকে নিয়ে তিনজনের একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি গঠন করেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে এই কমিটি যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা থেকে জানা যায় --- "১৯৫২ খ্রীঃ পর্যন্ত পুনর্বাসন বিভাগ ২,৩০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন দিয়েছে। এর মধ্যে ৮৯ শতাংশ পরিবার পুনর্বাসন স্থানে থেকে যায় আর ১১ শতাংশ পরিবার আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে পুনর্বাসন স্থান ত্যাগ করে।"[৩৮]

সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী নানা সংস্থার সহযোগিতায় বহু উদ্বাস্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ১৯৬১ খ্রীঃ তথ্যানুসারে "শতকরা প্রায় ৩৪ জন কৃষিকেন্দ্রিক, ২৫ জন চাকরিতে, ২১ জন শিল্পে, ১৩ জন ব্যবসা বাণিজ্যে এবং প্রায় ৭ জন পরিবহনে। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের তুলনায় এরা চাষ-আবাদের চেয়ে শহরাঞ্চলের জীবিকা বেছে নিতেই বাধ্য হয়েছে। অবশ্য জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পঃ দিনাজপুর, মালদহ, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় চাষ-আবাদই এদের শতকরা ৪১-৭৩ জনের অন্ন জোগায়। হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমানে এরা প্রধানত (৪২-৬৬ শতাংশ) পরিবহন এবং শিল্পজীবি আর দার্জিলিং, বীরভূম, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর এবং কলকাতায় শতকরা ৪৯ থেকে ৬১ জন চাকরিজীবি।"[৩৯]

কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলেও সেই চেষ্টায় বৈষম্য ধরা পড়েছে। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে বাঙালি ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সমতা ছিলনা। পরিসংখ্যান মতে -- "৩১সে মার্চ ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত, বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ১৭৬ কোটি টাকা। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য ১১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা পেয়েছে ১৯১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। যেখানে বাঙালিদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোন অর্থই দেওয়া হয়নি।" [৪০]

এই আর্থিক বৈষম্যের কথা তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি (১।১২।১৯৪৯) চিঠি দিয়ে পরিস্কার জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত চিঠির আংশিক উদ্ধৃত করা গেল ---

"প্রিয় জওহর,

.... তোমার ধারণা উদ্বাস্তুদের 'সাময়িক সাহায্য' (রিলিফ) এবং পুনর্বাসনের জন্য তোমার সরকার পশ্চিমবঙ্গকে "বিরাট পরিমাণ অনুদান' (লার্জ গ্রান্ট) দিয়েছে। তোমার কি জানা আছে যে এই উদ্দেশ্যে বিগত দু-বছরে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯-৫০, তোমার সরকার থেকে মোট অনুদান পেয়েছি ৩ কোটি টাকার সামান্য বেশী এবং বাদ বাকী ৫ কোটি টাকা এসেছে ঋণ হিসেবে ? তোমার জানা আছে কি যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যয় হয়েছে তার তুলনায় এই টাকা 'নিতান্ত নগণ্য' (আনসিগনিফিকেন্ট) ? তুলনা করতে চাইনা, কারণ তা মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে হয়ত পারে। কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, এ অবধি ১৬ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য যে অর্থ দিয়েছ তা নগণ্য। দু-বছরের জন্য মাথা প্রতি মোট দান হচ্ছে ২০ টাকা। তুমি কি এটাকে বিরাট দান বলবে ? .... উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ১৫ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু সবকিছু খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, এরা অভুক্ত। এখানে অন্তত অভুক্ত থাকবে না, এ আশাও এদের নেই। মাসের পর মাস পার হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তু সমস্যা বলে যে একটি সমস্যা আছে, তাই স্বীকার করতে ভারত সরকার রাজী নয়। সুতরাং এদের দায়িত্বও সে গ্রহণ করেনা। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব সে করছে। উদ্বাস্তুদের দু-বছরে মাথাপিছু ২০ টাকা অনুদান দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মহৎ সাহায্য বৈ কি। ....।" [৪১]

তোমার বিশ্বস্ত

বিধান

বিধান রায়ের চিঠির উত্তরে জওহরলাল নেহরু (২।১২।১৯৪৯) যে উত্তর দিয়েছেন তার সারকথা ছিল ---

"প্রিয় বিধান,

তোমার ১লা ডিসেম্বরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ, তুমি ঠিকই বলেছো, অনুদান নয়, ঋণ শব্দটি ব্যবহার উচিত ছিল আমার।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কত টাকা সাময়িক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছে আমি জানি না। ....।" [৪২]

প্রতিসহ তোমার
জওহরলাল নেহরু

নেহরু'র এই চিঠি থেকে পরিস্কার কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি ছিলেন উদাস মনোভাবাপন্ন। এবং পাঞ্জাবে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি নরম মনোভাবের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পাঞ্জাবের প্রায় ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান দ্রুত সম্পুর্ণ হয়েছে। আর ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার অনুমোদিত মাত্র ১০২ টি কলোনির উন্নয়ন হয়েছে। অবশিষ্ট কলোনিগুলির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ---- "স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু অর্ধাহার, অনাহার এবং অশিক্ষার গ্লানি নিয়ে কোনমতে বেঁচে আছে।" [৪৩] অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের মন থেকে সেদিন গ্রহণ করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই ১৯৭১ খ্রীঃ পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আগত কোনো উদ্বাস্তুকে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিক অধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে বলার কথা যে, ১৯৭২ খ্রীঃ আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস্তুহারা ব্যক্তিদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন কল্পে 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরী করে। ওই পরিকল্পনায় ১২৫.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ের হিসেব ধরা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে সামান্য অদল বদল করে ১৫০.০৫ কোটি টাকার প্ল্যান তৈরী করলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয়ের অর্ধেক ছেঁটে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব এখানে যেমন স্পষ্ট তেমনি স্পষ্ট অন্যান্য (বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, উড়িয্যা) রাজ্যের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেও। বৈমাতৃসুলভ মনোভাব থেকে সেদিনের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৪ সালে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের প্রদত্ত ঋণের একটা অংশ মুকুব করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক ১৯৭৪ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে একটি নোটে উল্লেখ করেছেন। যে নোটটি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত। নোটটি নিম্নরূপ -----

(১) প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বাবদ সাহায্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিস্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

(২) এইভাবে প্রদত্ত ঋণের টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য সফল হয়নি বলে তাদের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যও নেই।

(৩) নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে আশা করা গিয়েছিল যে, উদ্বাস্তুরা তাদের পূর্ব পাকিস্তানের বাড়ি-ঘরে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু সেই আশাও পূর্ণ হয়নি। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি থেকে উদ্বাস্তুরা কোনও প্রকার সুযোগ সুবিধা পায়নি।

(৪) পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঋণের বিরাট এক অংশ ক্ষতিপূরণ খাতে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ উদ্বাস্তুই কোনও দাম না দিয়ে বাস্তুত্যাগীদের জমি-জমা পেয়েছে। সরকারও তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কল্পে উক্ত খাতে ৮২ কোটি টাকা সাহায্য স্বরূপ প্রদান করেছে এবং উদ্বাস্তুদের ঋণ বাবদ প্রদত্ত সম্পূর্ণ টাকারই ক্ষতি বহন করতে সম্মত হয়েছে। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিকল্পনা ছিল না। [৪৪]

অর্থাৎ কেবলমাত্র জবরদখল উপনিবেশগুলিকে আইন সম্মত করার এবং সরকারী উপনিবেশগুলিতে উদ্বাস্তুদের দখলীকৃত জমিতে অধিকার তথা স্বত্ব প্রদান করার দাবি ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'মাস্টার প্ল্যান'টিকে কোন গুরুত্বই দেননি। উপরন্তু জবরদখল জমি সম্বন্ধে নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ১.২৫ লক্ষ বাস্তুভিটাকে ১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নিয়ম সম্মতভাবে তৈরী করা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নিয়েছে। বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে আসলে যা ঘটেছে তা হলো -- প্রায় অর্ধেক সংখ্যক উদ্বাস্তুকে সামান্য কিছু বৃত্তিগত অথবা ব্যবসায়িক অথবা গৃহ-নির্মাণ অথবা জমি কেনার জন্য সামান্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই ঋণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখানো হয়েছে পুনর্বাসন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হিসেবের মধ্যে। ১৯৬১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুঃখের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রককে লেখে --- "অ-চাষী শ্রেণীর সমস্ত পরিবারকে নির্বিচারে সামান্য কিছু করে ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করা হয় শুধুমাত্র তারা যাতে উদ্বাস্তু শিবিরে ত্যাগ করতে প্রলোভিত হয় এই উদ্দেশ্যে।" [৪৫] আসলে, বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন মহৎ নীতি বা ইচ্ছা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের ছিলনা। ফলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য মন্ত্রক মোট যত টাকা ব্যয় করেছে তার বেশী অংশ ব্যয় হয়েছে ত্রাণ শিবিরগুলিতে, পুনর্বাসনের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের সচিব এস.এন. ব্যানার্জী ১৯৬১ খ্রীঃ ১৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের সচিব ধর্মবীরকে যে চিঠি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ---- "চরম সত্য কথা হল ১৯৬১ সালের লোকগননায় পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার যে বিস্ময়কর বৃদ্ধির হার জানা গেছে তার উপরে ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার বহন করার মত আর্থিক অবস্থা এই রাজ্যের নেই। .... মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মত পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণ তহবিলের সুবিধা

পাননি, যার থেকে তাঁদের ঋণের কিছুটা অংশ মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের বেলায় পুনর্বাসন মন্ত্রককে বিশেষ টাকা অবধি ঋণ মুকুব করতে হয়েছে, অনুগ্রহ পূর্বক একথাও বিবেচনা করবেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা নেহরু-লিয়াকত চুক্তির এতটুকুও সুবিধা লাভ করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে পরিত্যক্ত স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি থেকে কিছুমাত্র আর্থিক উপকার একটি মানুষও পাননি।" [৪৬] যদিও Finance Commission 1973 তে এইসব বৈষম্য দূর করার লক্ষে একটি কথাই বলেছে ---- "বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি ন্যায় বিচারের খাতিরে, এই সমস্ত পার্থক্য তুলে দেওয়া উচিত।" [৪৭] কিন্তু বলার কথা যে, এই কথা শুধু ফাইলেই বন্দি হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সবকিছুই ছিল আশার কথা, বাস্তব রূপান্তরের কথা নয়।

গবেষক রণজিৎ রায় পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যা করেছে বা করেনি তার একটা তুলনামূলক আলোচনা তথা পরিসংখ্যান তৈরী করেছেন, পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ -----

	কাজ	পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য	পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য
১।	উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৎসর	১৯৪৭	১৯৫৫-৫৬
২।	যে বৎসর কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলিকে পুনর্বাসনের অবশিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করতে বলে	১৯৬০	১৯৬০
৩।	মুসলিম দেশত্যাগীদের জমির পরিমাণ প্রায় যা বিনামূল্যে বন্টন করা হয়েছে	৭০ একর	০
৪।	২০ হাজার টাকা মূল্যের নীচে দেশত্যাগী মুসলিমদের বাড়ির সংখ্যা (বিনামূল্যে বন্টিত)	প্রায় ৭ লাখ	০
৫।	ক্ষতিপূরণ হিসাবে বন্টিত দেশত্যাগী মুসলিমদের শহরের বাড়ির সংখ্যা	৩০২,৩০০	০

৬।	ক্ষতিপূরণ হিসাবে কেন্দ্রের অনুদান	৯১ কোটি টাকা	০
৭।	কেন্দ্রের খরচে তৈরি বাড়ি, দোকান ইত্যাদির সংখ্যা (ক্ষতিপূরণ হিসাবে বন্টিত)	২২১,০০০	০
৮।	পাক সরকারের কাছে দেশ বিভাগের পূর্বে উদ্বাস্তু কনট্রাকটের সব রকম দাবি কেন্দ্র পূরণ করেছিল ?	হ্যাঁ	না
৯।	দেশ বিভাগের পূর্বে উদ্বাস্তুরা রেশনের দোকান, শস্যভাণ্ডার, মদের দোকান ইত্যাদির জন্য পাক সরকারের কাছে যেসব জামানত রেখেছিলেন কেন্দ্র	হ্যাঁ	না
১০।	উদ্বাস্তু কনট্রাকটররা পাক সরকারের কাছে যেসব জামানত রেখেছিলেন, কেন্দ্র তা দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১১।	পাক আদালতে দেওয়া আমানত, এবং সরকারের কাছে দেওয়া অন্যান্য ছোটখাট জামানত কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১২।	পাক আদালতে ডিক্রি বাবদ উদ্বাস্তুদের দাবি কেন্দ্র মিটিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৩।	পাকিস্তানে প্রাপ্য উদ্বাস্তুদের বেতন, ছুটির বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং জমা দেওয়া পরীক্ষার ফি কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৪।	পাকিস্তানে প্রাপ্য উদ্বাস্তু ছাত্রদের স্কলারশিপের অর্থ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না

১৫।	পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের যৌথ কোম্পানির সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৬।	পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা যেসব ক্ষতিগ্রস্ত নোট এনেছিলেন, তার বদলে টাকা কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৭।	পাক সরকারের কর্মচারী ছিলেন যেসব উদ্বাস্তু তাঁদের কেন্দ্র পেনসন দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৮।	১৯৩৫ সালে কোয়েটার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব মানুষ দেশ বিভাগের পরে ভারতে এসেছেন, কেন্দ্র তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ?	হ্যাঁ	প্রশ্ন ওঠে না
১৯।	পাক সরকারের যেসব কর্মচারী পঙ্গু হয়েছিলেন, তাঁদের পেনসন কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
২০।	উদ্বাস্তুদের সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসে কাজ জুটিয়ে দেবার জন্য সরকারের বিশেষ দপ্তর গঠিত হয়েছে ?	হ্যাঁ	না
২১।	এইসব দফতর ও কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ও অন্যান্য জায়গায় চাকরি পাওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা	২০২,০০০ (১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত)	২০৪ (১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত)
২২।	১৯৪৭ সাল থেকে ৫ বছরের মধ্যে সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা	কয়েক লাখ	নামমাত্র (যদি থাকে)

২৩।	সুদসহ ঋণ এবং অগ্রিমের বিনিময়ে কেন্দ্র যে সব দোকান, বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে তার সংখ্যা	০	কয়েক হাজার
২৪।	কেন্দ্রের খাতায় হাতেকলমে শিক্ষা পাওয়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যা	৯২,০০০ (১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত)	নামমাত্র
২৫।	নতুন শিল্প তৈরি করতে বিশেষ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্র কাঁচামাল দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না (এমনকী পশ্চিমবঙ্গের চালু শিল্পগুলোও তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে)
২৬।	জমি দখল করে এবং উন্নতি করে সুদনা সহ ঋণের বিনিময়ে কেন্দ্র দিয়েছে ?	(দেশত্যাগী মুসলিমদের ছেড়ে যাওয়া জমির পরিমাণ ছিল প্রচুর)	হ্যাঁ (কয়েক লাখ একর)
২৭।	জমি কিনতে, বাড়ি বানাতে এবং ব্যবসায়িক ঋণ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ (তবে ক্ষতিপূরণের সঙ্গে তা মিটমাট করে নেওয়া হয়েছে)	হ্যাঁ (খুব অল্প সবটাই সুদসহ ঋণের বিনিময়ে)
২৮।	উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা	৯ লাখ ৪৩ হাজার	১০ লাখ ৪৩ হাজার (১৯৭০ পর্যন্ত হিসাব)
২৯।	যেসব পরিবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ফেলে আসা জমি, দোকান, বাড়িঘর ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা	১০ লাখ ৩ হাজার (মোট উদ্বাস্তু পরিবার থেকে ৬০,০০০ পরিবার বেশি)	০

৩০।	দিল্লিতে উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা	৬০ হাজার	জানা নেই
৩১।	দিল্লিতে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা	৯৮ হাজার (মোট ০ উদ্বাস্তু দাবিদার থেকে ৩৮,০০০ বেশি) [৪৮]	

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৭ খ্রীঃ ১১ ডিসেম্বর রাজ্য ভিত্তিক উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ ---

Statewise Break up of Refugees	in thousands
West Bengal	316
Assam	487
Tripura	374
Bihar	67
Uttar Pradesh	16
Orrisa	12
Manipur	02
Madhya Pradesh	01
Andamans	04
Total	1,279 [৪৯]

উল্লেখ্য যে ভারত বিভাগের জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের পতাকাতলে সম্মিলিত হয় ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য ভারতবাসী। এদের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এক ছিল না। এক ছিলনা তাদের সম্প্রদায়গত বিভিন্ন অসুবিধে, বিভিন্ন সমস্যা। তাদের প্রত্যাশা ছিল কংগ্রেস নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়ে এক অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ গঠন করবে। কিন্তু কংগ্রেস জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমশ হিন্দু সংগঠনে পরিণত হয়। ফলে মুসলিম মানসও কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তার ধারক হিসেবে মুসলিম লিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম মতভেদ, দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। এই দ্বন্দ্বটিকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ

সরকার ভারত বিভাজনকে ----- "Partition is a direct result of communalism"[৫০] বলে মত প্রকাশ করেছে।

পরিশেষে ২০১১ খ্রীঃ সারা বিশ্ব জুড়ে কত মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে সেই তথ্য রাষ্ট্র সংঘের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় -- নৈরাজ্যের ফলে গত বছর প্রায় আট লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে ভিনদেশে গিয়ে শরণার্থীর খাতায় নাম তুলতে বাধ্য হয়েছে তারা। এক বছরে এত বেশি সংখ্যক মানুষের শরণার্থী হওয়ার ঘটনা গত ১১ বছরে এটাই প্রথম। শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউ.এন.এইচ.সি.আর আরো জানায় একই সময়ে অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৩ লক্ষ। এছাড়াও ২০১১ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বে প্রায় চার কোটি ২৫ লক্ষ শরণার্থী ছিল। এর মধ্যে দেশ ছেড়ে ভিনদেশে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী ছিলেন ১ কোটি ৫২ লক্ষ, আর অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ২ কোটি ৬৪ লক্ষ মানুষ এবং আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার। গত ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউ.এন.এইচ.সি.আর আরো জানিয়েছে বিশ্বে লোকজনকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার হার বেড়েছে। শরণার্থী হিসেবে জীবনযাপনের সময়ও বেড়েছে। একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মানে, তাকে দীর্ঘদিন শরণার্থী শিবিরে বা অন্য কোথাও উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে হয়। ইউ.এন.এইচ.সি.আর আরো জানিয়েছে ২০১০ সালের শেষ দিকে আইভরি কোস্টে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরবর্তী অস্থিতিশীলতার পর থেকে মানবিক সঙ্কট তৈরী হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে একই ধরণের সঙ্কট লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান সহ বিভিন্ন দেশে সংক্রামিত হয় ফলে বছর না ঘুরতেই প্রায় ৪৩ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর মধ্যে আট লক্ষ মানুষ বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। জাতি সংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার আন্তেনিও গুতেরেস বলেন --- ২০১১ সালে বাস্তুচ্যুত হওয়ার সমস্যাটি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। নৈরাজ্যের কারণে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে অসংখ্য লোককে অবর্ণনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে ইউ.এন.এইচ.সি.আরের প্রতিবেদনে কিছুটা আশার আলোও রয়েছে। তাদের মতে ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বিশ্বের মোট শরণার্থীর সংখ্যা কমেছে। ২০১০ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বে শরণার্থী ছিল ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত প্রায় ৩২ লক্ষ লোক পরে নিজেদের বাড়ি ফিরে পায়। তবে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ শরণার্থী হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে (২৭ লক্ষ)। এর পরের স্থান ইরাকের (১৪ লক্ষ)। মানে প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত উদ্বাস্তু হওয়ায়, বা উদ্বাস্তু সমস্যা সারা বিশ্বে বর্তমান।

(বিঃদ্রঃ - প্রতিবেদনটি 'দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ' সম্পাদক - তৈমুররাজা চৌধুরী, শিলচর, ২০।০৬।২০১২ থেকে নেওয়া।)

সূত্র নির্দেশ

১। Cornelius Ryans : The Shorter Oxford English Dictionnary, 1956, P-1689.

২। A.S. Hornby with A.P. Cowic (Edited) : Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, 1974, P-708.

৩। Cornelius Ryans : The Random House Dictionary Ballantine Book's, 1978, P-753.

৪। Cornelius Ryans : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-15, 1981, P-568.

৫। স্যার মনিয়ের উইলিয়াম ঃ আ স্যান্সক্রিট-ইংলিশ ডিকশনারি, ১৯৮৬, দিল্লি।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঙালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্শন, ১২৮৭।

৭। Cornelius Ryans : The Last Battel, Pocket Books, New York, 1967, P-15.

৮। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৬।

৯। Rufugees : The Dynamics of Displacement : Zed Books, London, 1986.

১০। The New Encyclopaedia Britannica, P-569.

১১। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

১২। Rufugees : The Dynamics of Displacement, London, 1986.

১৩। The New Encyclopaedia Britannica.

১৪। অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা - ১৯৮৭, পৃ-৯১।

১৫। সংবাদ প্রভাকর - ২০শে জুন, ১৯৫৭ খ্রীঃ।

১৬। বসুমতী, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩১ খ্রীঃ।

১৭। কুনাল চট্টোপাধ্যায় অনুদিত ঃ আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কলকাতা - ১৯৮৯।

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবন্ধ)।

১৯। অমলেন্দু দে ঃ পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা - ১৯৭২, পৃ-৭২।

২০। Aziz Ahmed : Islamic Modernism in India and Pakistan, (1857-1964), P-161.

২১। Vide File No. F. 163/40 - R, National Archives of India, New Delhi.

২২। অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮-১৯৪৭) ৪৯ পর্ব, দেশ, ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৯।

২৩। M.A. Zinnah speaches and writings, Vol-II, P-403-404.

২৪। তাজুল ইসলাম হাশমী ঃ ঔপনিবেশিক বাংলা - কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ-৫৯।

২৫। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উদ্বাস্তু, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ-৩৩৭।

২৬। তদেব, পৃ-৬০-৬১।

২৭। তদেব, পৃ-৬১।

২৮। কমলেন্দু ধর (সংকলিত) ঃ স্বাধীনতা-উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ-৪৩।

২৯। তদেব, পৃ-৫৩।

৩০। শিবাজী প্রতিম বসু ঃ ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে (প্রবন্ধ) ঃ দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা ঃ (সম্পা) সোমন্তী ঘোষ, ১৯০৯।

৩১। তদেব।

৩২। অনিল সিংহ ঃ পশ্চিমবঙ্গ শরণার্থী সমস্যা, কলকাতা - ১৯৯৮।

৩৩। শিবাজী প্রতিম বসু ঃ ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৪। Relief and Rehabilitation of Displaces Persons in West Bengal. Statement issued by Government of West Bengal, Dec - 15th, 1958, Table - 3.

৩৫। তদেব, Table - 5.

৩৬। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৭। তদেব।

৩৮। তদেব।

৩৯। কমলেন্দু ধর (সংকলিত), পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪০। A Master Plan for Economic Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal. Refugee Relief and Rehabilitation Development. Government of West Bengal, July, 1973.

৪১। তাপস ভট্টাচার্য ঃ বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, কলকাতা, ১৪১১।

৪২। তদেব।

৪৩। তদেব।

৪৪। রণজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ঃ কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব রাজনীতি (প্রবন্ধ), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতাঃ (গ্রন্থ) সোমন্তী ঘোষ (সম্পা), কলকাতা, ২০০৯।

৪৫। তদেব।

৪৬। তদেব।

৪৭। তদেব।

৪৮। তদেব।

৪৯। Relief and Rehabilitation of Displaces Persons in West Bengal. Statement issued by Government of West Bengal, (Dec - 11th, 1957).

৫০। তাজুল ইসলাম হাশমী ঃ ঔপনিবেশিক বাংলা - কলকাতা, ১৯৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু

ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু ঃ—

মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও উদ্বাস্তু জীবন যাপনের মধ্যে একই সঙ্গে থাকে নিহিত স্মৃতি এবং বেদনা, আর্থিক অনিশ্চর্য়তা ও বহুবিধি সঙ্কট, মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন কোন লেখকেই তা এড়িয়ে যেতে পারেনা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা - গল্প- নাটক-উপন্যাসে ঘর ছাড়া ছিন্নমূল নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন এবং সমস্যার কথা কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও উপন্যাসকার নানা ভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই উদ্বাস্তু নিঃসঙ্গ মানুষের কথা ওতপোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন চর্যাগীতি। এর পর প্রায় আড়াইশ বছর বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এর প্রধান কারণ তুর্কী আক্রমন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বিহার ও বাংলা বিজয়ের অভিযান শুরু করেন। বাংলা দেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের ভিত্তিস্থাপন করেন। এরপর বাংলার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় দখল করেন। সেই সঙ্গে বরেন্দ্রভূমি জয় করে দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করে, তুর্কীরী সমগ্র বাংলাদেশ ও তার চারপাশের অঞ্চলে মুসলিম শাসন বলবৎ করেন ১২০১-০৫ খ্রীঃ মধ্যে। এই মুসলমান শাসকের মূল লক্ষ্য ছিল বল পূর্বক অপরকে (হিন্দু) ধর্মান্তরিত করা ---- অপরের সংস্কৃতি বিধস্ত করা। ফলে তুর্কী শাসকরা হিন্দুর দেবদেবীর মঠ, মন্দির, শিক্ষায়তন, চতুষ্পাঠী, দেবমূর্তি ও বিহার ধ্বংস করে সেই সব স্থানে মসজিদ ও মুসলিম শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করে। সেই সঙ্গে নারী নির্যাতন, হত্যা ও গৃহদাহের মাধ্যমে হিন্দুদের উপর নির্বিচার অত্যাচার শুরু করে। প্রাণ ভয়ে - সন্ত্রস্ত হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পুঁথিপত্র নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। অনেকে বাঁচবার জন্য বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তবে রাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় কেবল ধর্মীয় অত্যাচার, অনাচার ও অবিচার প্রবল হয়ে ওঠেনি তুর্কী সৈন্যরা গ্রামের কৃষিপণ্য জবরদখল করে শ্রমিকদের বেগার খাটিয়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। দেশব্যাপী ঘোর অরাজকতা ওদুর্দিনে মানুষের জীবন যখন নানাদিক থেকে বিপন্ন ও অনিশ্চিত তখন গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টাই ছিল মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। ফলস্বরূপ মানুষ হয়েছে গৃহহীন, দেশহীন, বস্তুভিটাহীন

উদ্বাস্তু।

ভারতের প্রাচীন দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' গ্রন্থে উদ্বাস্তু হওয়া,দেশত্যাগ করা ও নিঃসঙ্গ জীবনের কথা উল্লেখ আছে। 'রামায়ণ'-এ রামচন্দ্রের বনবাস এবং 'মহাভারত'-এ পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস, প্রকৃত পক্ষে উদ্বাস্তু জীবনের নামান্তর। তবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ সরাসরি পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ পাঁচালী'-তে। কবি কৃত্তিবাস পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝার দেশত্যাগের কারণ উল্লেখ করে লিখেছেন -----------

"বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।" [১]

'প্রমাদ' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা হেতু নরসিংহ ওঝা দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে কুলিয়ায় আশ্রয় নেন। এইভাবে মধ্যযুগে অনেক হিন্দু বা কবিরা শাসক শ্রেণির অত্যাচারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন যদিও পরবর্তীতে তারা পুনর্বাসন পেয়েছেন এবং কাব্য রচনা করে তাদের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও জনজীবনের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

মধ্যযুগের অন্যতম কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দীর্ঘ অংশ জুড়ে গৃহত্যাগের করুণ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তোডরমল্ল নির্ধারিত নীতি অনুসারে যখন রাজস্ব নির্ধারণ, মুদ্রা সংস্কার প্রভৃতি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হল তখন কৃষক-প্রজা-ব্যবসায়ী জমিদার, তালুকদার শ্রেণিকে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিল ডিহিদার মামুদ শরীফের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব। ফলস্বরূপ মুকুন্দরাম দামুন্যা গ্রাম ত্যাগ করে বাধ্য হয়েছেন।

"উজির হৈল রায়জাদা বেপারিয়েদেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হল্য অরি ....
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
.... দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই।" [২]

ফলে দেশত্যাগী কবির উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে মুখ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে, আসলে উদ্বাস্তু হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনে অনাহারে, লাঞ্ছনা, নিরাপত্তাহীনতা কবিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। তাই কবি লেখেন -----------

"...... উপনীত কুচট্টানগরে।
তৈল বিনে কৈলু স্নান করিলুঁ উদক পান

শিশু কান্দে ওদনের তরে
.... ক্ষুধা - ভয়-পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই খানে।" [৩]

এ ক্ষেত্রে পরিস্কার যে কবি মুকুন্দরাম নিস্পৃহ ভাবে ঐতিহাসিকের মতো উদ্বাস্তু-জীবনের যন্ত্রণা ও বেদনার কথাতুলে ধরেছেন। এছাড়া ও 'মনসামঙ্গল' এর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পিতা শঙ্কর নিরাপত্তার অভাবে নিজ গ্রাম কাঁথড়া (হুগলী) ত্যাগ করেন। 'শিবায়ণ'-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রাজশক্তির-অত্যাচারে অর্থাৎ হেমৎ সিংহের অত্যাচারে মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম ত্যাগ করে কর্ণগড় নামে অন্য একটি গ্রামের জমিদার বা সামন্ত রামসিংহের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রামসিংহ কবিকে অযোধ্যানগরে বসত বাড়ি নির্মান করে দেন। এই প্রসঙ্গে কবি উল্লেখকরেন -----------

"পূর্ববাস যদুপুর হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীতি
স্থাপিয়া কৌশিক তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।" [৪]

এছাড়া ও চৈতন্য সমকালিন বঙ্গদেশে ও জাতিগত বিদ্বেষ, শাসক দলের বেপরোয়া অত্যাচারে, ধর্মান্তকরণের ফলে দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে প্রাণ রক্ষা করেছে। যদিও চৈতন্যদেব নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যদিয়ে, অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে হিন্দু - মুসলমানকে একাসনে বসাতে পেরেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মধ্যযুগে রাজশক্তির দ্বারা বিক্ষিপ্তভাবে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অবশ্য বর্গী আক্রমণের ফলে (১৭৪২-১৭৫১ খ্রীঃ) বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষের গৃহত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে দিনকার ভয়াবহ মারাঠা আক্রমণ ও অত্যাচারের ফলে প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলে দলে লোক গৃহহারা বাস্তুহারা হয়ে উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, কলকাতায় শরণার্থী হয়ে চলে এসেছিল। সেই ঘটনা অবলম্বনে কবি গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য সম্পর্কে মহাশ্বতাদেবীর উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য --- "এই বইয়ে (মহারাষ্ট্র পুরাণ) রাঢ় ও গাঙ্গেয় বঙ্গের ভীত এস্ত-নিহিত ও আত্মরক্ষায় পলায়মান সমাজের এক আশ্চার্য বাস্তব চিত্র উদঘাটিত হয়।" [৫]

খ) আধুনিক বাংলাকবিতায় উদ্বাস্তু ভাবনা ঃ—

"নিজেদেরই দেশে থাকিনা পালাই দূরে
কে আর শূন্য ভাঁড়ার দু-হাতে খুঁড়ে
দেখবে রয়েছে স্মৃতি জুড়ে মৌমাছি !
কে রাখবে বলো চিরকাল বুকে জুড়ে
সাহস গিয়ে, সব কিছু গেছে দূরে
দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি।"
(দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি / শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

দেশভাগের মধ্যে যে মানবিক আর মানসিক ভাগাভাগির যন্ত্রণা, তার প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী একবার বলেছেন "সে (প্রকাশের) ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি।" সত্যি কি তাই ? কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে না হয় বিষাদের থেকে আনন্দের বার্তা হিসাবেই এসেছিল দেশভাগ, কিন্তু সেই আনন্দের রেশ সরতে না সরতেই পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভাষা,সংস্কৃতি,তথা রাজনীতির লড়াই সেখানে দেশভাগের বিশালত্বকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ? বিশেষত যখন দেখি দেশভাগের আগে উনিশশো তেতাল্লিশের দুভিক্ষ, তে ভাগা, শ্রমিক আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশভাগের পরের ভাষা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোন কিছুই কিন্তু চোখ এড়িয়ে যায়নি এ -পার - ও-পারের কবি - সাহিত্যিকদের। এই পর্বে বাংলা কবিতার আলোক উদ্বাস্তু, নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে।

দেশভাগের পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিচিত্রতর দিক প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ঘটনাটিকে বাঙালির দিক থেকে দুটি প্রেক্ষণ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভবছিল --- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার তিরিশের যে কবিরা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে ছিলেন তাঁরা কবিচরিত্রে ছিলেন আন্তর্জাতিক। প্রথম মহাযুদ্ধের ভাঙন, ইউরোপের সমাজে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল এই পর্বের কবিরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে প্রথাসিদ্ধ ঘরাণা আর ভারতীয় আদর্শের চিন্তাভাবনা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে এই তিরিশের কবিরাই বিশেষ ভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিস্থিতি তথা নিঃসঙ্গ মানুষের কথা বাংলা কবিতায় তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশ্বপরিস্থিতি তথা বিশ্বসঙ্কটের রূপরেখাটি দেখার চেষ্টা করবো অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণুদে, প্রেমেন্দ্রমিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস,

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি কবিদের কবিতা থেকে।

কবি অমিয় চক্রবর্তী। যিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইউরোপে (অকসফোর্ড) ছিলেন। দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের আশঙ্কিত প্রহরগুলি অনুভব করেছেন প্রত্যক্ষ ভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেতিনি লিখেছে 'হাইফা' (অভিজ্ঞান বসন্ত) নামে কবিতা। যেখানে একটি ইহুদি পরিবারকেদেখেছেন -----

"হোটেলটা খুলচে মা বাপ মেয়ে-- ইহুদি
বারুদাগ্নি য়ুরোপ হতে
পালিয়ে ঠিকালো এই ডাঙায় বিপদের স্রোতে।"

ইহুদি-দের কথা একমাত্র অমিয় বাবুর লেখায় পাওয়া যায়। যুদ্ধের ফলে যে মন্বন্তর সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে তিনি লেখেন ----------

"অন্ন আছে,
লোভের মরাইয়ে ধ্বংস গোলায় অন্ন আছে
পণ্যরাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ
সে-পথ বন্ধ।" (অন্নদাও)

অন্য আরেকটি কবিতায় কবি যুদ্ধের ভয়াবহতার বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে লিখেছেন --

"বোমা - ভাঙা অবসান। ....
....
ঘাড় মোচড়ানো বহু গির্জা-ঘর ছড়ানো রাস্তায়,
যিশুমাতৃ রক্তমাখা
শুকনো পড়ে আছে ধারে ঘাসে ঢাকা।
চতুর্দেশী সৈন্যরাজ কীর্তির ওড়ায় পতাকা।" (ডুসেলডর্ফ, পারাপার)

এই কবিতায় বিধ্বস্ত জার্মানিদের প্রতি কবির সমবেদনা, সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় একটু অন্যভাবে অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র এঁকেছেন। উল্লেখ্য যে ১৯৪২ - এ কলকাতা জাপানি বোমা পড়ার আগে বোমা পড়ার আশঙ্কায়

যখন কলকাতার মানুষ আতঙ্কিত তখন কবি লিখেছেন -----------

"খুড়োহে খুড়ো গর্ত খুড়ো
গর্তে ঢুকে গপ্‌পো জুড়ো।
সঙ্গে রেখো নস্যি গুড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো।" (হিতোপদেশ)

আবার বোমার ভয়ে বাঙালিরা যখন কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র যেতে প্রস্তুত ঠিক তখনই ব্রিটিশের 'denial policy' বা 'পোড়ামাটি নীতি'র বিরুদ্ধে কবি লেখেন -----------

"........রুশাচার হতে পারে, দেশাচার নহে।
বোমা পড়ি যায় যাবে বাড়িখানা নাড়ি
ছাড়া যাবে যাক, কিন্তু কলিয়ারি মম
পোড়াইলে কী খাইব ! মিল কারখানা
যদি ধ্বংস করি যায় ইংরাজ আপনি
তবে মোর মোর শেয়ারের মূল্য কী, বলহ।" (পোড়ামাটি)

কবিতাটির মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতির যথার্থ রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ খ্রীঃ লেখা কবির আরেকটি কবিতায় স্বরাজপন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় -----------

"স্বরাজ স্বরাজ চ্যাঁচায়
স্বরাজ কি ফলে গাছে !
স্বরাজ রয়েছে আধ পয়সার
আস্ত কাতলা মাছে !
জাপানীরা যদি আসে
পশুরাজ যাবে বসুরাজ হবে
মুক্ত করবে দাসে।" (পিতাপুত্র সংবাদ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯৪৫ যখন মিত্রপক্ষের জয়ের মুহূর্তে ধিককৃত হয়েছে আনবিক বোমা বিস্ফোরণের অমানবিকতা তখন কবি লিখেছেন -----------

"মুখ পোরাটা অনুমান
জাপান পোড়লি

জানিস কি রে সেই আগুনে
কাকে পোড়ালি ?

....

পোড়ালিরে জাতির মুখ
দেশের পোড়ালি।" (হনুমান জয়ন্তী)

বাংলার প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম কবি বিষ্ণু দে। ১৯৪২ খ্রীঃ কমিউনিস্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দ নিহত হলে বাংলায় তার প্রতিবাদে "ফ্যাসিস্ট - বিরোধী লেখক ও শিল্প সঙ্ঘ" গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান থেকে বিষ্ণুদেরলেখা ষোল পৃষ্ঠার একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী '২২শে জুন, ১৯৪২' নামে কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। কবিতা সংকলনটিতে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বৈনাশিকতার প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। কবি লিখেছেন -----------

"জলে স্থলে যুদ্ধে চলে, ভারতে ও ভিৎটলে প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখাঝাড়ে দূর দেশে দেশে।" (২শে জুন, ১৯৪২)

সেই সময়ের প্রাসঙ্গিক মন্বন্তর কে বাস্তব সম্মত ভাবে তুলে ধরে কবি লিখেছেন -----------

"লঙরখানার শান - বাঁধানো ভিড়ে
দেখিবে ভাই কলকাতার কেতা
রাজা উধাও টাকশালের চিড়ে
কোথায় লীগ মহাসভার নেতা।"

১৯৪৪ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের ব্রিটিশ সরকারের খাদ্য-মজুত নীতি, মুদ্রাস্ফীতির বিপুলতা ও আসাধুতা এবং ১৯৪৩ খ্রীঃ মন্বন্তর কবির কলমে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে এইভাবে -----------

"খাস ইংরাজী কাগজের টাকা জাপানী ফানুষে লাল
বিস্তর লোক বেচে দেয় বটে কাস্তে হাতুড়ি হাল
জাল দড়ি মাকু, বিস্তর লোক ভিখারী সেজেছে বেশ।" (চতুর্দশপদী)

আবার 'সাতভাই চম্পা' কবিতায় কবি সেদিনের বাঙালি অসহায় ও দ্বিধালাঞ্চিত পরিস্থিতি তুলে ধরে লিখেছেন -----------

"আবিশ্ব সমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায়।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়াবহতা, মন্বন্তর যে কবিকে সবচেয়ে বেশী বেদনা দিয়েছে তিনি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কবি লিখেছেন ----------

"নগরের পথে পথে দেখেছে অদ্ভুত এক জীব,
ঠিক মানুষের মতো
কিম্বা ঠিক নয়
যেন তার ব্যঙ্গ চিত্র বিদ্রূপ বিকৃতি।

....

জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়।

....

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে
ক্ষুধা-শীর্ণ মুখে সেই তুলে দিই ফ্যান
মনে হয় সাধি এক পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ।" (ফ্যান)

এই কবিরই আরেকটি কবিতায় যুদ্ধের সামগ্রিক রূপরেখা ফুটে উঠেছে এইভাবে ----------

"হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের।
দিগ্বিদিক ঢেকে দেওয়া শকুন - ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হয়ে।" (জনৈক)

কলকাতায় তখনো বোমা পড়েনি, পড়বে পড়বে অবস্থা। যখন তখন সাইরেণ উঠে। আতঙ্কে মানুষ গৃহহীন হয়ে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। যার ছবি ফুটে উঠেছে কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ---

"ঐ শোনো গো কুকুর কণ্ঠ বাঁশি
বেজে উঠলো তীব্র বাঁকা সুরে
আকাশ পথে আসছে মরণ ডালা
উজোড় করে ফেলবে ঘরে ঘরে।
ওগো মেয়ে রাখ তোমার সাজ
এখন ওঠো ওঠো
মাটির তলে গর্ত আছে খোঁড়া
সেথায় গিয়ে জোটো।" (একপয়সার একটি)

মন্বন্তরের সময়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাম্যবাদী কবিরা মানুষের মরণান্তিক বিপর্যয়ের ছবি তুলে ধরেছেন, যার মধ্য অন্যতম কবি অরুণ মিত্র। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ---------

"রাস্তাবোঝাই তোমরা কাঁপতে থাকলে
আড় পিছু অস্থির সওয়ার
নিয়ে যাবে ঠাসা মৃত্যুর খাসা ঘরে।"
(রাস্তাবোঝাই তোমরা, উৎসের দিকে)

কবি কিরণশঙ্কর রায় লিখেছেন -

"দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত দীর্ণ পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা শীতল মাটিতে
কঠিন হাড়ে স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে।" (ব্লাক আউট নেই)

মনীন্দ্র রায় একটি কবিতায় লিখেছেন -----------

"..... দিনান্তে কাঁকর অন্ন চোখে ভাসে হাওড়ার ময়দান।
ঠাঁই নেই পথে, ঘরে। যাই খোঁজে শামুক বাজার।
বিলোল নিশীথে আছে জঙ্গী ট্রাকে পণ্যের সন্ধানে।
জানি। তবু পাথরেও কাঁটাগুল্মে জীবন নাচার।" (ছায়াসহচর)

এখানে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, চালের দুষ্প্রাপ্যতা, মুদ্রাস্ফীতি, অশান্তি প্রভৃতি অণুষঙ্গ উঠে এসেছে।

কবি দিনেশ দাসের মননে ও কলমে চিরকালই মানুষ প্রধান বিবেচ্য। তিনি যুদ্ধ তাড়িত জনসাধারণ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনতার জন্য কলম উজাড় করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ----------

"আজকে দেখি সবাই হল বধ্য
যুগের যত অমর কলা কবর হল সদ্য
ননীর মতো নরম শিশু তুলোর মত বৃদ্ধ
সপ্লিনটারেতে সবাই সমছিদ্র।" (হাতুড়ি)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -----------

"নগরের দীর্ঘ পথ ডাস্টাবিনে পিচে
অজস্র পায়ের শব্দ আকাশের নিচে
সারি সারি চলে তারা কংকালের
মিছিলের মতো
তাদের কিছুই নেই, শুধু একমরণ উদ্যত।" (রাজধানীর তন্দ্রা)

অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের মহাশূন্যতার মূর্ত হয়ে উঠেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। কবি লিখেছেন

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে / শূন্য ঘর শূন্যগোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে / শুকনো তুলসীর মঞ্চে -
নিস্প্রদীপ অন্ধকার নামে / আগাছায় ভরেছে উঠোন।
.... পথে পথে পদশব্দ ওঠে / আকাসে নক্ষত্র কোটে।" (স্বাগত)

আরেকটি কবিতায় লিখেছেন -----------

"পথের দুদিকে বাসা / বেঁধেছে কঙ্কাল,
গ্রাম করে খাঁ খাঁ / উঠোনের এক কোনে
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে / ভগ্নদূত শাঁখা।" (এই আশ্বিনে)

কবি সমর সেন মন্বন্তরের বিপন্নতা ও শূন্যতাকে অতীব প্রগাঢ় সহমর্মিতায় রূপ দিয়েছে কবিতায়। কবি লিখেছেন -----------

"একাগ্র ক্ষুধার জ্বালা
দেহ দীর্ণ করে ক্ষুধার অঙ্গার জমে

নীড় নেই, মারী দিগ্বিজয়ী
স্ত্রীকন্যা গিয়েছে অন্য পথে
নিরুদ্দেশ নরকে।" (গৃহস্থ-বিলাপ)

অন্য আরেকটি কবিতায় লিখেছেন -

"নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে
রক্তমাখা হাত দেখি সাজানো বাগানে।" (নষ্টনীড়)

কমিউনিস্ট কর্মী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় একই সঙ্গে উঠে এসেছে নিঃসঙ্গ মানুষ, দুর্ভিক্ষ ও মজুতদারির বাস্তব দৃশ্য। কবি লিখেছেন -----------

"আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে।
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে।
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

....

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংসগর্ভ সংকটনাশন।" (বিবৃতি)

পরিশেষে কবি জীবনানন্দের কবি ভাবনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর কিভাবে ধরা পড়েছে তা উল্লেখ করেই স্বাধীনতা (দেশভাগ) পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বাসভূমি হারানোর যন্ত্রণা এবং সমকালীন কবিতার প্রেক্ষাপট আলোচনার যতি টেনে পরবর্তী পর্বে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু তথা বাস্তুচ্যুত মানুষের ছবি বাংলা কবিতায় কিভাবে উঠে এসেছে সে দিকে তাকাবো। কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন ----

"চারিদিকে ভাঙনের ঝড়ো শব্দ,
পৃথিবী ভাঙার কোলাহল,

....

তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর
সূর্যালোকিত সব স্থান

যদিও লঙ্গর খানা
যদিও শ্মশান।"

(কার্তিকের ভোর - ১৩৫০)

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর 'মাংসাশীর প্রতি বিজ্ঞাপন' কবিতায় দেশভাগের সম্ভাবনাময় মুহূর্তের জন্য একদেশদর্শী ভাবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কেই আক্রমণ করে কবি লিখেছেন --------

"আসুন ! আসুন ! কার তাজা মাংস চাই
হাতে যেন থাকে খাঁটি খদ্দেরের থলি
ভীষণ সস্তা মাংস নিয়ে যান ভাই
অহিংসার হাড়কাঠে দিয়েছি এ বলি,
পরম সাত্ত্বিক মাংস গঙ্গা জলে ধোয়া
রামধনু গেযে গেয়ে তবে বলি দেওয়া।"

কবিতার শেষ দুই চরণে লিখেছেন ----------

"ভয় নেই আমাদের মাংস নিরামিষ
সর্বত্রই ব্রাঞ্চ আছে দিল্লি হেডাপিস।"

কবিতায় শব্দের ব্যবহারে পাঠক মাত্রই বুঝতে অসুবিধা হয়না যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও নরহত্যার জন্য কবি কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়কেই দায়ী করেছেন সরাসরি।

দেশ ভাগের প্রেক্ষাপটে আধুনিক বাংলা কাব্য - সাহিত্যে ও উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা, যন্ত্রণা ও স্মৃতিকাতরতার ছবি ফুটে উঠেছে। ১৯৫০ খ্রীঃ কবি বিষ্ণুদে লেখেছেন -----------

"এখানে -ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায়
হাঁপায়। পার্কের ধারের শানে পথে-পথে গাড়ি -
বারান্দায়। ভাবে ওরা কীযে ভাবে। ছেড়ে খোঁজে
দেশ। এই খানে কেউ বরিশালে কেউ বা ঢাকায়।" (জলদাও)

অন্য আরেকটি কবিতায় তিনি লেখেন -

"মনচাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারের ফলে

মিলে। দপ্তরে চত্বরে-উল্লাসে সংকটে গানচাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তুহারা শেডে।" (গান)

কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের একটি কবিতা 'উদ্বাস্তু'-তে বাস্তু হারানোর প্রসঙ্গ আবেগ মথিত স্বরে প্রকাশিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে গৃহ ত্যাগ করে ভূষণ। গৃহ ত্যাগ কালে ভূষণের ছেলে বারবার ফিরে-ফিরে ঘর-বাড়ি দেখতে থাকে। নিজের ছেলেকে ব্যঙ্গ করে ভূষণ বলে ওঠে ----------

"আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে,
আমাদের নিজের দেশ নতুন দেশে
নতুন দেশের নতুন জিনিস, মানুষ নয়, জিনিস
সে জিনিসের নাম কী ?
নতুন জিনিসের নতুন নাম উদ্বাস্তু।"

কবি মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় সমকালীন বাস্তবতার ঢেউ আচড়ে পড়েছে। ১৯৫৫ খ্রীঃ লেখা তাঁর 'চিঠি' কবিতায় আমরা দেখি পাবনা অঞ্চলের এক বৃদ্ধ উদ্বাস্তু রমণী উন্মাদ হয়ে বলেছেন ----------

"................... সেই বাড়ি
এতোটুকু হতে যারে চিনি
আর সেই ঘর পূবদুয়ারী
সিঁদুরে আমের সেই চারা
সবই আজ পরের অধীন.........।"

শুধু ফেলে আসা দেশের স্মৃতি নয়, উদ্বাস্তু ও নিঃসঙ্গ জীবনের লাঞ্ছনার ছবি ও এঁকেছেন কবি মণীন্দ্ররায় ১৯৫৫ খ্রীঃ 'নক্সীকাঁথার কাহিনি' কবিতায়। কবিতাটিতে কবি এক উদ্বাস্তু গৃহ বধূর জীবনের করুণ কাহিনি তুলে ধরেছেন -----------

"কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে ?
কে দেখেছে এত গ্লানি রানাঘাটে, ক্যাম্পে, ক্যাম্পে, পথে
উড়িষ্যার তেপান্তরে, জনহীন দীপান্তরে আর
হাওড়ার স্টেশনে ?
অচল পয়সার মতো পরিত্যক্ত ....।"

তবু ও পথ ভ্রান্ত, দিগভ্রান্ত এই গৃহ বধূটি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে -

"........... তবু বার বার
কে এমন ফিরে আসে, ঘর বাঁধে, কার এত আশা ?
দারিদ্র্যের কাঁটাগাছে দুরন্ত স্বপ্নের রাঙাফুল
ফোটাতে কে জানে।"

অন্য দিকে উদ্বাস্তু ছিন্নমূল, বাস্তুহীন মানুষের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলতে কবি নিঃসঙ্গ মানুষের সংস্কৃতিক চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আয়োজন করেন রবীন্দ্র উৎসবের, 'উৎসব' কবিতায় কবি লেখেন

"উদ্বাস্তু ক্যাম্পের এই রবীন্দ্র উৎসব। ইচ্ছা হলে মনে করতে
পারো সবই ছেলেখেলা। কিন্তু ভাবে যদি এদের সাজানো স্বপ্ন
জ্বলে গেছে বিষের ছোবলে, এবং ক্ষুধা ও মৃত্যু শতপাকে
বেঁধেছে সম্প্রতি। তখনই হয়তো বুঝবে কী বলছে এনগন্য
উৎসব ! বজ্রের অঙ্গার ঢেকে অশ্বত্থ মেলেছে কী বৈভব।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেন জমিদারের রোষে উদ্বাস্তু হয়ে পনেরো-যোলো বছর এক সাধুর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে ঘুরেছে। যদিও উপেনের স্মৃতিকাতরতা ও যন্ত্রণা আধুনিক মানুষকেও বিদ্ধ করে বিষন্ন করে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় তার 'যন্ত্রণার স্মৃতি-বিস্মৃতি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন -----------

"..........আমাদের সেই সময়ের উদ্বাস্তু দলে দলে সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন, সেই দিনগুলোর যন্ত্রণা এখন অনুভব করাই কঠিন। আমি বা আমরা যারা সেদিনের সেই ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে এতোদূর এসেছি, আজো বেঁচে আছি, তারা সেই সব দিনের স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারবো না।" [৬] সত্যিইতো সেদিনের অসহ্য কষ্ট, স্বজন হারানোর দুঃখ, বাস্তুহারানোর যন্ত্রণা ভুলতে পারেননি বলেইতো নাম পরিচয়হীন একজন মানুষ যারা দুটো ভাতের জন্য, একটু মাথাগুজবার জন্য জীবনের সব সুখকে ত্যাগকরে কতো বার কত জায়গা বদল করেছে। যদিও সাজানো সুন্দর বাড়ি-ঘর কর্মক্ষেত্র, ফেলে হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়েছে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, তার পর একটু খাবার। এই সব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে ছিল বাঁচার তাগিদ। অথচ ধর্ম রক্ষা, জাতিপরিচয় নিয়ে বাঁচতে সেদিন মানুষ বাস্তুভূমি ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে ভিন দেশে। ফেলে আসা জীবনের দেশও মানুষের অমোঘ স্মৃতি রোমন্থন হয়ে উঠেছে কবি মঙ্গলাচরণের কবিতা। কবি লেখেন -----------

"মন যখন মরুভূমি, দগ্ধ দিন, দুপুর
আগুন, ঘরে আগুন, দেহে আগুন প্রাণচিতায়।
জীবন ফণিমনসা, তারবিষ বিষের কাঁটায়
রক্ত-সেই রক্ত রেখে ঊর্ধ্বমুখ উধাও
মন যখন চাতক চায় স্ফটিক জল, ডানায়
তখন তুমি হাওয়া ? ....
বাংলা ? হলো বাংলা ? তুমি বাংলাদেশ আমার।" (বাংলা, হায় বাংলা)

অর্থাৎ দেশভাগের পর যখন যন্ত্রণাদগ্ধ মরুভূমির শূন্যতা দিয়ে দিনযাপন করছে তখন অতীতের ফেলে আসা স্মৃতি সত্যিই বেদনাবিধূর। সেই স্মৃতিকেই আরো উদাস করে তুলেছেন কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত। তিনি লেখেন -----------

"কে তোমাকে বুকে রাখবে / শিশুর মতন
বাংলাদেশ / কে জড়ায় চেতনা আমার
সস্নেহে-প্রত্যয়ে ?/ বাংলাদেশ।
কে আমাকেদিন থেকে রাত / রাত থেকে দিনের
অবিরাম স্পর্শ ধন্যতায় / প্রত্যেক নিমেষে
নিয়ে যায় বাংলাদেশ।" (একবার ভেবে দ্যাখা)

এই অস্থিরতা আকুলতাই তো দেশ ছেড়ে আসা মানুষের বুকে দাউ-দাউ আগুন হয়ে জ্বলছে। অগ্নি দগ্ধ সেই স্মৃতিই জ্বলে উঠেছে কবি সুনীল কুমার নন্দীর কবিতায় -----------

"কেমন আছি ? কলজেখানা দুভাগ করে ভালই আছি।
মাঝে মধ্যে তোমার মতো উড়াল দেওয়া পাখির সঙ্গে
কলজেখানায় কেমন যেন একটুখানি মোচড় লাগে,
ও কিছু নয় ....।" (ফিরতে গিয়ে)

সুনীল বাবুর কবিতার অগ্নিদগ্ধই তিল তিল করে দগ্ধ করেছে কবি অন্নদাশংকর রায়কে।সেই দগ্ধ জীবন যন্ত্রণা থেকেই কবি লেখেন -----------

"হৃদয় এসেছি রেখে পথে যেতে যেতে
বিস্তীর্ণ নদীর চরে, পাকাধান ক্ষেতে।

বাউলের আখড়ায়, চাষীর কুটিরে।
মাঝিদের নৌকায়, স্টিমারের ভিড়ে
প্রদেশ একদা ছিল, আজ পরদেশ।
পাসপোর্ট ভিসাবিনা নাইকো প্রবেশ।" (এপার থেকে ওপার বহুদূর)

একই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় -----------

"কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়, তখন
পদ্মা আমাকে দিয়ে দিয়ে ছিল বিদায়
আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
আমিই আমাকে ছেড়েছি মধ্যরাতে।" (একা)

দেশভাগের দুঃখ কষ্টের অংশীদার কবি কৃষ্ণ ধর-এর কবিতায় বিষন্ন স্মৃতি জর্জরিত হয়ে উঠেছে ------

"সীমান্তের ওপার থেকে তাড়া খেয়ে
আগুন আর নেকড়েদের দাঁত আর জিভ এড়িয়ে
একদিন সে এসেছিল ....
তার কোন নাম নেই আর
সে এখন ডি ডি এ-র ২০১ নম্বর ভিলেজে
৩৮৪০৫৬ / ১ নম্বর রিফিউজি
আপাত ডেজার্টার।" (ইস্টিশানের চাতালে সে)

দেশভাগের ফলে একটি মানুষ কিভাবে 'মানুষ' এই পরিচয় থেকে নম্বর চিহ্নিত হলো তার কথা নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে উঠে এসেছে উক্ত কবিতাটিতে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'ধাত্রী' কবিতায় লেখেন -----------

"শিয়ালদার ফুটপাথে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে
যে-কেউ ভাববে দিনকাল এক হেঁজিপেজি বাহাত্তুরে রিফিউজি
আঁতুড় গরে আমার মুমূর্ষু মায়ের কোল থেকে উনি বুড়ি

একদিন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন
এর ডাঁটো শরীরের স্তন্যপান করেছিলুম
প্রতিদিন শুষে নিয়েছি রক্ত।"

কবির এই নষ্টালজিক স্মৃতি রোমন্থন, যা আমাদের রক্তের ভিতর খেলা করে। কবি রাণা চট্টোপাধ্যায় তার পূর্বপুরুষদের ফেলে আসা স্মৃতিতে মর্মহত হয়ে কলম ধরেছেন। লেখেন -----------

"আমার পূর্ব পুরুষেরা বসে দেশভাগ দেখেছিল
তারপর নিজেরাও স্বার্থপরের মতো ভাগ হয়ে গিয়েছিলো
আমাদের এখন দেশ নেই, ভিটে নেই, আত্মীয় স্বজন নেই
উঠোনে কোন গাছ নেই যা দেখতে পাখিরা আসবে
মেঘ এসে বসবে ডাল ধরে
এখন প্রবাসী কুয়াশার মতো চৈত্র শেষের বলাকারা
উড়ে যাচ্ছে দিগন্ত ছাড়িয়ে।" (আমার পূর্ব পুরুষ)

নমিতা চৌধুরী ঠিক তেমনি ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া অতীতকেই বেদনার্ত ভাবে প্রকাশ করে আপন মনে -----------

"চোখের সামনে মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পাই
আমার বাবার মত অজস্র বৃদ্ধের শরীর
যাদের দেখি ক্রমাগত ক্ষয়ে যেতে যেতে এগিয়ে যায়
বেঁচে থাকবার আশায়, খুঁজে নিতে চায়
এতটুকু নিশ্চিন্ত আশ্রয়।" (উদ্বাস্তু জীবনের কাব্য)

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'উদ্বাস্তু' কবিতায় বাস্তুভূমি ছেড়ে যাওয়ার বাস্তবতাকে দেখাতে গিয়ে লেখেন -----------

"চল, তাড়াতাড়ি কর,
আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড় বেরিয়ে পড় এখুনি।
ভোররাতের স্বপনভরা অদূরে ঘুমটুকু নিয়ে
আর পাশ ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে

সময় নেই।"

কিংবা

"গরু দুইতে হবেনা, খেতে দিতে হবেনা,
মাঠে গিয়ে, বেঁধে রাখতে হবে না।
দরজা খুলে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক আমাদের মত।"

কিংবা

"......... ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে আগে ওরা কারা ?
ওরা ও উদ্বাস্তু।"

অর্থাৎ একটু পা বাড়িয়ে চলার আহ্বান তুলেছেন কবি। কারণ আর নয়, বিপন্ন মানুষের স্রোতে কবি সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার পরার্মশ দিচ্ছেন। কারণ ভয়ের কিছু নেই রাত্রির অন্ধকারে যারাই সামনে তারাও সবাই উদ্বাস্তু, সবাই গৃহহীন, বাস্তুচ্যুত হয়ে কিংবা বেঁচে থাকার প্রত্যাশায় সব কিছু ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার পথ ধরেছে। শেয়ালদহ স্টেশনে আসার পর এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি কি ছিল ? পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে যারা এসেছে তাদের মুখ দিয়েই কবি সাগর চক্রবর্তী শুনিয়েছেন সেকথা ----------

"রাতের বেলায় ইস্টিশনে
সুন্দর বনের বাঘের বিষম আনাগোনা
ইস্টিশনের মিষ্টি ফুলের লোভেই বুঝি।
বাঘের-পেটেই গেলো কুলি চম্পা বীনা-সোনাকাকী
পেটের দায়ে।" (রিফিউজি)

অর্থাৎ এ-পারে এসেও উদ্বাস্তুদের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হয়নি।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ এর রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং এর সার্বিক ফলশ্রুতিতে দেশভাগ - যা বাঙালি জীবনকে নাড়িয়ে দিয়েছে, কাঁপিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা রেখা বিভক্ত হয়ে গেছে, বিভক্ত হয়ে গেছে মানুষের মন-হৃদয়। তবুও স্মৃতি যে বেদনাবহুল সেই অর্থেই বাংলা কবিতায় স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠেছে বার বার ফেলে আসা দেশ-গৃহ-ক্ষেত আর নদীনালার কথা। সেখানে মিশে আছে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি আর জন্মভূমির ঐকান্তিক ভালোবাসা। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের 'বন্ধুর পথে' কবিতাটিতে

তেমনি এক অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় অনুভূতি যা শিরদাঁড়ায় শিহরণ তোলে। কবি লেখেন ----------

"কবর এখন তোমায় ডাকিছে
আমায় ডাকিছে চিতা।"

এই অনুভূতি চোখে পড়ার নয়। তেমনি চোখে পড়েনা কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'খুকু ও খোকা' ছড়ার সর্মবেদনার স্বরূপ -----------

"তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো
তার বেলা ?"

সেই সঙ্গে ওপার বাংলার স্মৃতিচারণ করে কবি লেখেন ----------

"মনে মনে জপকরি সেই সব নাম
নওগাঁ কুস্টিয়া আর ঢাকা চট্টগ্রাম,
কুমিল্লা, ময়মনসিংহ আর রাজশাহী
.... প্রদেশ একদা ছিল, আজ পরদেশ।" (এপার থেকে ওপার বহুদূর)

ওপার বাংলার রক্তাক্ত দাঙ্গা যাদের সর্বস্বান্ত করলো তাদের স্মৃতিকে বহন করে, কবি সুনির্মল বসু লেখেন -----------

"সোনার স্বদেশ হইল শ্মশান, স্বর্গ নরক হলো
প্রেত-পিশাচের প্রলয় নৃত্যে দেশ করে টালোমলো।" (অভিমান)

এই কল্পনাতীত অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত-এর কবিতায়। কবি লেখেন -----------

"ভূগোল-ইতিহাসে আমরা এক
একমন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা।" (পূর্বপশ্চিম)

তবুও শিকড় ছিড়ে চলে যেতে হয় উদ্বাস্তু হয়ে ওপার থেকে এপারে। দ্রুত গতিতে সমস্ত পরিবার কে একসঙ্গে নিয়ে।

অন্যদিকে কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক জাতীয় কংগ্রেসের এবং মুসলিমলীগের

শীর্ষ নেতাদের খামখেয়ালিপনার ফল রক্তাক্ত দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন "কী খাবে আমাদের হাড় গিলে বউগুলি, ন্যাংটো নচ্ছার ছেলেমেয়ে।" (বাংলা ভাঙার কবিতা)

উক্ত কবিতার শেষ স্তবকে কবি ঘোষণা করেছেন -----------

"ঘর ভাগ হোক
ভাগ হতে দেবনা, দেহটা প্রাণটা।"

সেদিনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে কবি দিনেশ দাস তার 'পনের আগষ্ট, ১৯৪৭' কবিতায় ভাঙ্গাহৃদয়ে ছলছলে নয়নে লেখেন - "সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ।" আবার 'পদাতিকের' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' বা কবি চিত্ত ঘোষের 'তোমাকে ভুলতে পারিনা' কবিতায় দেশভাগের যন্ত্রণা যেন নীল হয়ে ফুটে উঠে। পূর্ব পশ্চিমের বিভেদকে অস্বীকার করে কবি সুভাষের বাঁধভাঙা আহ্বান -----------

"দুয়ারে খিল
টান দিয়ে তাই / খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলাদেশ / এপারে ও সেই বাংলা।"

সেই যন্ত্রণারই প্রতিছবি যে চিত্ত ঘোষের কবিতায় -----------

"কি করে ভুলব -ভুলতে পারিনা তোমাকে।" (তোমাকে ভুলতে পারিনা)

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী একদিকে বেদনায় বিধুর, অন্যদিকে কঠোর প্রতিজ্ঞায় সদম্ভে উচ্চারণ করেন -----------

"দেয়াল উঠে দুভাগ করে আমাদের
.... মায়ের দেওয়া ভাষা ভেঙে ও অস্থিরতা।" (অন্যযুগ)

সবস্মৃতি, আবেগ, অনুভূতি ফেলে পূর্ব বাংলার (হিন্দু) মানুষের পরিস্থিতির ক্রমোন্নতির আশঙ্কায় সব ফেলে চলে আসতে হয়ে স্বাধীন ভারতে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু মাটির রস, উতলা হাওয়া আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কৈশোর যৌবনের স্মৃতি কেউই ভুলতে পারে নি। পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ফেলে আসার ফলে ফিরে যাওয়ার টান প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে উদ্বাস্তু মানুষ। কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ঠিক তেমনি কোন এক উদ্বাস্তুর স্মৃতিতে আপ্লুত হয়ে লেখেন -----------

"তোমাকে বলেছিলাম যেত দেরিই হোক

আবার আমি ফিরে আসব।
.... আজও আমার ফেরা হয়নি।" (তোমাকে বলেছিলাম)

স্বাধীনতা এসেছে হিংসা আর ঘৃণার উপর। রক্ত আর মৃত্যুর উপর। এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে অভিমানে কবির উচ্চারণ -----------

"............এই ভাগাভাগির
নেশাই আমাদের
গঙ্গাযাত্রা করিয়ে ছাড়বে।" (ভাগাভাগির খেলা)

কেন ? সেই উত্তর কবি দিয়েছেন এই ভাবে -

"র‍্যাডাক্লিফের ছুরিতে সেই দেশতো নিমেষে
মুছে গেল।" (খুলনার জাহাজ ঘাটা)

প্রসঙ্গত বলার কথা, মাউন্টব্যাটেন ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন ২৪শে মার্চ ১৯৪৭। ৩রা জুন ঘোষণা হয়েছিল দেশভাগ। স্বাধীনতা এসেছিল তারও আড়াই মাসপর। দেশ ভাগ মেনে নিয়ে ছিল অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা, কিন্তু গান্ধী আকুল ভাবে চেয়েছিল স্বাধীনতা, আবার আকুল ভাবে চেয়েছিল দেশকে অখণ্ড রাখতে। বিশেষ স্বাধীনতা দিবসের বর্ণময় উৎসবের মধ্যেই দুচোখে অশ্রুর রেখা নিয়ে বেলেঘাটায় এক মুসলমান বস্তিতে বসে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করেছেন এই মহানায়ক। সেই যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসাকে ধরেই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন -----------

"ফিনকি দিয়ে উঠছে রক্ত, সেই রক্ত গায়ে মেখে কত মানুষ
মেতে উঠেছে স্বাধীনতার উৎসবে।" (সেই দিনটি)

অর্থাৎ কবি বলতে চান দেশভাগ ও এই চুক্তির স্বাধীনতা আমাদের সমস্ত সত্তা, ধ্যান ধারণা ও সংস্কারকে দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে।

দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুর স্রোত এপার বাংলার জনপদ গুলিকে ভরিয়ে দিয়েছে। এপার বাংলার প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তাদের অপরিসীমা সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হয়। সেই সংগ্রামময় জীবনের সৃষ্টি তাড়িত করে কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীকে। কবি লেখেন -----------

"এখন রক্তাক্ত আঙুল খোঁজে আদিগন্ত মেঘের ব্যাণ্ডেজ

এখন স্বদেশ বললে
বিতাড়িত ভরঘুরে ঠিক আর বোঝে না কিছুই।" (এখন স্বদেশ)

কবি কৃষ্ণ ধরের 'ইস্টিশনের চাতালে সে' কবিতাটি দেশভাগের পরিণামে এক উদ্বাস্তু হতভাগী রমণীর ইতিবৃত্ত হয়ে উঠেছে। কেননা মানুষের অবমাননা কিভাবে হয় তারই বাস্তব সম্মত চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি লেখেন -----------

"দেশভাগে মার খাওয়া এক বেওয়ারিস হতভাগী রমণী
জন্মের মত ঘুমাচ্ছে।"

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় দেশভাগের নিদারুণ যন্ত্রণায় শিক্ষিত বেকার যুবকের হাহাকার কবিতায় রূপ দিয়েছেন এইভাবে -----------

"বাপের চোখের অভিসম্পত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোনঃ ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্য ঘর যা পেলাম পা তো টানে না
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।" (জননী যন্ত্রণা)

সেই সঙ্গে অনাহারে মৃত্যু প্রসঙ্গে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছে -----------

"অনাহারে মৃত্যু নয়। অনাহারে মৃত্যু নয়। কাল সারারাত তুমি
পৃথিবীকে ইচ্ছামতো কামড়ে, ছিঁড়ে খেয়েছ। সমস্ত রাত
তার শান্তি ! ....শান্তি .... ! শান্তি ....!"
(না খেয়ে লোক মরেনা)

এছাড়া ও পুরাণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সে দিনের যন্ত্রণাগ্রস্থ জীবনের ছবি এঁকেছেন এই ভাবে --

"সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছে রক্ত-পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে।" (বেহুলা)

কবি অরুণ মিত্র দেশভাগের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। আর পারেননি বলেই কবি হৃদয়ের যন্ত্রণারদগ্ধ ক্ষোভ উগড়ে পড়েছে কবিতায় -----------

"অপরিচিত জ্যোস্নায় পাহারা বদল হল
চলন্ত লৌহ শিরস্ত্রাণ শ্রেণী যেন করাতের দাঁত
আমাদের কারাগারের কপাট কেটে
আমাদের বনেদী শিকলের জোড় কেড়ে
বুড়ো বটের অগুণ্ডি শিকড় দিখণ্ড করে
আমাদের দাঁড় করিয়েছিল শড়কে ময়দানে।" (সঞ্জীবন)

স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্ মুহূর্তে যুদ্ধ বিধ্বস্ত কলকাতার দুঃখী মানুষের নবজাগরের চিত্র, মিছিলে উত্তাল কলকাতা নগরীর বুকে মিলিটারীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। কবি লেখেন -----------

"রক্তে আর আগুনে লাল
১৯৪৬ সালের - নভেম্বর।
ক্ষিপ্ত বহ্নি গ্রাস করে পথে পথে
অত্যাচারীর জয়রথ
হাজরার মোড়ে মিলিটারী-লরী জলে
কাতারে কাতারে।" (নভেম্বর গুচ্ছ)

দেশভাগ ও পারিপাশ্বির্ক পটভূমি নিয়ে কবি লেখেন -----------

"পথে যেতে দেখি কঙ্কাল সার গাছে
কালো কালো ফুল-কাকগুলো বসে আছে
পীতপ্রায় মাঠে বসেছে বুড়ির কাছে
শীর্ণবৃদ্ধ। জরিফু পটভূমি।" (পটভূমি)

কিংবা

"গভীর সে রাত। স্তূপীকৃত পাহাড়ের সমাধির মতো।" (তদেব)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুহূর্তে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর অত্যাচারে ব্যথিত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়

বাংলাদেশের প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি লেখেন -----------

"বিষন্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্তে নির্নিমেষ
এ আমার সাড়ে তিনহাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।" (যদি নির্বাসন দাও)

অন্যদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী পর্বে উদ্বাস্তু শিবিরের এক দুপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি সুব্রত চক্রবর্তী লেখেন -----------

"তখন দুপুর ছিল, ভালোবাসা ছিল না / কোথাও
মর্মের ভিতরে অগ্নিকণা উড়েছিল অশ্বক্ষুরে
মর্মের ভিতরে তীব্র চেরা স্বরে ডেকেছিল / কাক
তখন দুপুর বেলা ভালোবাসা ছিল না / দুপুর।" (দুপুর)

এখানে উল্লেখ যে দেশভাগের সময় ভারতীয় ঔপমহাদেশের রক্তাক্ত দাঙ্গার স্মৃতি আজও মাদের কাছে পুরানো হয়নি, তা এখনও টাটকা। সেদিন ছিন্ন বিছিন্ন মৃতদেহ ও করুণ আর্তনাদকে উপেক্ষা রেই এপার বাংলায় চলে এসেছে বহু মানুষ। এপারে এসে নাম নয় নম্বর নিয়ে নিজেদের পরিচয় বানিয়েছে। ক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, গৃহহারা হয়েছে অসংখ্য জন। ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছিল খণ্ডিত বাংলার ন্তে। চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ে যেতে দেখেছে, দেখেছে নিজের স্ত্রী- বোন-মাকে নির্যাতন করছে ধর্মীরা। নিহত হতে দেখেছে নিজের আত্মীয়-পরিজনকে। এই সব বাস্তব স্মৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা তায় এক অভিনব আঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক যাদের কবিতা আলোচ্য পর্বে তুলে ধরা হলো তাছাড়াও অগনিত কবির তা রয়ে গেছে। ক্ষুদ্র পরিসরের জন্য তাদের স্থান দেওয়া গেলনা। যেমন - তারাপদ রায়ের 'বাংলাদেশ' য়া মুখোপাধ্যায়ের 'হিমঘরের মাছ' মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'স্বাধীনতা' তারাপদ আচার্যের 'নৌকাবাঁধা নদীমুখ' ংকুমার ভট্টাচার্যের 'ভাগের মা' পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষের গল্প' গনেশ বসুর 'অমৃত আস্বাদ মৃত্যু দেশ' 'খরা' সাগর চক্রবর্তীর 'রিফিউজি' শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বের কবিতা' মঞ্জুষা দাশগুপ্তের 'মনে দুঃখ' শুভ বসুর 'সনজিদা' রাণা চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার পূর্বপুরুষ' জয় গোস্বামীর 'নন্দরমা' মনীন্দ্র 'চিঠি' প্রভৃতি কবিতা।

বাংলাদেশের প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি লেখেন -----------

"বিষন্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্তে নির্নিমেষ
এ আমার সাড়ে তিনহাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।" (যদি নির্বাসন দাও)

অন্যদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী পর্বে উদ্বাস্তু শিবিরের এক দুপুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি সুব্রত চক্রবর্তী লেখেন -----------

"তখন দুপুর ছিল, ভালোবাসা ছিল না / কোথাও
মর্মের ভিতরে অগ্নিকণা উড়েছিল অশ্বক্ষুরে
মর্মের ভিতরে তীব্র চেরা স্বরে ডেকেছিল / কাক
তখন দুপুর বেলা ভালোবাসা ছিল না / দুপুর।" (দুপুর)

এখানে উল্লেখ যে দেশভাগের সময় ভারতীয় উপমহাদেশের রক্তাক্ত দাঙ্গার স্মৃতি আজও আমাদের কাছে পুরানো হয়নি, তা এখনও টাটকা। সেদিন ছিন্ন বিছিন্ন মৃতদেহ ও করুণ আর্তনাদকে উপেক্ষা করেই এপার বাংলায় চলে এসেছে বহু মানুষ। এপারে এসে নাম নয় নম্বর নিয়ে নিজেদের পরিচয় বানিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, গৃহহারা হয়েছে অসংখ্য জন। ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছিল খণ্ডিত বাংলার দুপ্রান্তে। চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ে যেতে দেখেছে, দেখেছে নিজের স্ত্রী- বোন-মাকে নির্যাতন করছে ভিনধর্মীরা। নিহত হতে দেখেছে নিজের আত্মীয়-পরিজনকে। এই সব বাস্তব স্মৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা কবিতায় এক অভিনব আঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক যাদের কবিতা আলোচ্য পর্বে তুলে ধরা হলো তাছাড়াও অগনিত কবির কবিতা রয়ে গেছে। ক্ষুদ্র পরিসরের জন্য তাদের স্থান দেওয়া গেলনা। যেমন - তারাপদ রায়ের 'বাংলাদেশ' বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'হিমঘরের মাছ' মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'স্বাধীনতা' তারাপদ আচার্যের 'নৌকাবাঁধা নদীমুখ' বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'ভাগের মা' পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষের গল্প' গনেশ বসুর 'অমৃত আস্বাদ মৃত্যু বাংলাদেশ' 'খরা' সাগর চক্রবর্তীর 'রিফিউজি' শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বের কবিতা' মঞ্জুষা দাশগুপ্তের 'মনে পড়ার দুঃখ' শুভ বসুর 'সনজিদা' রাণা চট্টোপাধ্যায়ের 'আমার পূর্বপুরুষ' জয় গোস্বামীর 'নন্দরমা' মনীন্দ্র রায়ের 'চিঠি' প্রভৃতি কবিতা।

পরিশেষে দেশভাগ জনিত কারণে মানুষের জীবন কিভাবে বিপন্ন ও সংশয়ের মুখোমুখি হয়েছে তার দুটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরবো। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় লেখেন -----------

"আজ দেখছি ধর্মের আড়ালে আত্মা পড়েছে ঢাকা
মৃত্যু গন্ধে বাতাস হয়ে উঠে ভারি।" (ঝাঁপিয়ে পড়বার অপেক্ষায়)

কবি গনেশ বসু লেখেন -----------

"অর্ধেক খুলির ঘিলু নদী
পচা গলা মাংস মানুষের, মুণ্ডহীন সিংহ ঝড়
ছড়ানো হাড়ের ফ্রেম, বীভৎস শিশুর।" (অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ)

এই ভাবেই দেশভাগের বাস্তবতা বাংলা কবিতায় এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই বলা যায় স্বাধীনতা প্রাক্‌মুহূর্তে এবং পরবর্তী পর্বের বাংলা কবিতা যথার্থ রূপেই দেশভাগের ইতিহাসও বটে।

(গ) বাংলা ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন ঃ—

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতিবিদ্বেষ, দেশ বিভাজন প্রভৃতি অভিশপ্ত ঘটনার ফলে আধুনিক কালে যেমন মানুষ বেশী সংখ্যায় উদ্বাস্তু হয়েছে, তেমনি উদ্বাস্তু জীবনাশ্রিত ছোট গল্পও কম লেখা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বাংলার বুকে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার চিত্রটাই দেখি সর্বাধিক গল্পে। সেখানে অনাহারের তীব্রতাই চিত্রিত হয়েছে নানাভাবে। দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কাপড় ও কেরোসিনের সংকট, কালোবাজারি ও মজুতদারির অ-নৈতিকতা, নারীর সম্ভ্রম হানির প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে ছোটগল্পের বিষয়ে। মন্বন্তরকে প্রধান বিষয় করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভীড়' গল্পে ট্রেনের কামরায় দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত আলোচনা থেমে যায় এক বৃদ্ধের যুবক পুত্রের মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদে। 'পার্থক্য' গল্পে দুর্ভিক্ষের মধ্যেও মধ্যবিত্ত মানুষের মনে শ্রেণিস্বার্থ কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তারই স্বীকৃতি। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষলক্ষী' এবং 'বোবা কান্না' গল্পে মন্বন্তরের ভয়ংকর রূপ উদঘাটিত কিন্তু গল্পগুলির অবলম্বন ব্যক্তি মানুষের ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহানুভূতি, উন্মাদপ্রায় শোকতীব্রতা ইত্যাদি। তবে 'বোবা কান্না'তে লেখক যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। যুদ্ধের কারণেই দুর্ভিক্ষ সেকথাও উল্লেখ করেছেন। 'ইস্কাপন' গল্পটি ব্যক্তি চরিত্র কেন্দ্রিক হলেও কলকাতার বোমার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অন্যদিকে ইস্কাপন নামের এক অভাবি চোর শেষ পর্যন্ত মন্বন্তরের সময়ে কলকাতার পথের ভিখারিদের

হাসপাতালে স্থানান্তরিত করবার কাজে সরকারি গাড়ির চালকের চাকরি পায়। কিন্তু কাজটি করতে করতে তার নিজের উপরেই আসে ধিক্কার। শেষ পর্যন্ত সে দুর্ঘটনায় মারা যায়।

মন্বন্তর পীড়িত সময়, জীর্ণ হয়ে যাওয়া গ্রাম, কলকাতার ফুটপাথে মৃত্যু, লঙ্গরখানা, অন্নবস্ত্রহীন মানুষের দল নারীদেহের বেচাকেনা, মানুষের হিংস্রতা, উন্মত্ততা, অমানবিকতা সেই সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়, কন্ট্রাকটরদের মুনাফালোভ, কালোবাজারী, মধ্যবিত্তের দুর্গতি -- এসব বিষয় নিয়ে স্বাধীনতা প্রাক্ মুহূর্তে বহু ছোটগল্প লেখা হয়েছে। পরিমল গোস্বামীর 'শেষের হিসাব' গল্পটিতে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সময়ে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের হিসাবের খাতার পৃষ্ঠা কেবল তুলে দেওয়া হয়েছে কীভাবে একজন সংসারী মানুষ ব্যয় সংকোচের আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং কিছুতেই স্ত্রী-সন্তানের অন্ন সংস্থান করতে পারছে না তাই প্রকটিত হয় এই হিসাবগুলিতে। শেষদিনের পৃষ্ঠাশেষে লেখা আছে --- 'দড়ি ও কলসি' -- একটাকা চার আনা। তার পাশে মন্তব্য --- "সস্তায় কোথাও মিলিল না", তির্যক উপস্থাপনায় গল্পকার বাস্তবতা স্পর্শ করেছেন। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা' গল্পে মন্বন্তরগ্রস্ত মানুষের সংকট ও নারীর শরীর বিক্রয়ে বাধ্য হওয়ার প্রসঙ্গ বার বার উপস্থাপিত হয়েছে। মনোজ বসুর 'মন্বন্তর', 'বন্যা' প্রভৃতি গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে উচ্চবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণির বিপুল পার্থক্য, শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের কথা এসেছে। 'বন্যা' গল্পে দেখানো হয়েছে --- বন্যার জল এসে ধনী ও দরিদ্র সবাইকে সমভাবে বিপন্ন করেছে। দুর্ভিক্ষে সবাই একই সারিতে, সমস্ত ভেদাভেদ মুছে গেছে। গজেন্দ্র কুমার মিত্র 'ম্যায় ভুখা হুঁ' গল্পে দারিদ্র্য, অনাহার, ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেও মানুষ মানুষের জন্য স্বার্থত্যাগ করে --- এমনই এক মানবিক বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই তুলনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র কঠিনতর বাস্তবের গল্প লিখেছেন অন্নবস্ত্রের সংকট নিয়ে। তাঁর 'আবরণ' গল্পে পত্নীর নগ্ন শরীর দেখে দিশেহারা বংশী এক বারবণিতার ঘরে ঢুকে তার কাপড় কেড়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু গণিকা সুখদার নগ্ন দেহ দেখে পুনরায় বিচলিত হয়ে বংশী কাপড় ফিরিয়ে দেয়। উপরন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। 'রসাভাস' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন পেটের জ্বালায় চোরাই চাল পাচারকারী মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়া পাতাল পথ, সমাজ তাদের ক্লেদাক্ত করে, তারা নিজেরাও নিজেদের পঙ্ক-গহ্বরে ঠেলে দেয়। কোন প্রতিরোধ নেই, কারণ পেটে ভাত নেই। 'মদন ভস্ম' গল্পে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত এক নর-নারী যুগলের প্রেম নিঃশেষিত হয়ে গেছে। একবাটি সম্বল ভাত এখন তারা দুজনেই অপরকে না দিয়ে নিজেই খেতে চায়। এখানে ভাতের অভাবে আত্মা মলিন হয়ে গেছে। অন্নাভাবের সঙ্গে বস্ত্র আর কেরোসিনের তুমুল অভাবের গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'বস্ত্র' গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত ঘরে মানুষ একটু দাম বেশি হলেও কাপড় কিনতে পারে। কিন্তু গরিব ছাদেম তার স্ত্রী ও পুত্রবধূকে নগ্ন দেখে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় মৃতের শরীর থেকে ফেলে দেওয়া ন্যাকড়ার খোঁজে। মধ্যবিত্ত চরিত্র লেখক স্বয়ং তাকে একটা কাপড় দান করে। ছাদেম কাপড়টি গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করে। ছাদেমের

গলা থেকে কাপড় খুলে নিয়ে তার স্ত্রী ও পুত্রবধূ দু-টুকরো করে তাদের নগ্নতা ঢেকে জনসমক্ষে বেরিয়ে ছাদেমের জন্য কাঁদতে পারে / কাঁদার সুযোগ পায়। 'হাড়' গল্পে মৃত স্বামী কান্তারামের হাড় বিক্রি করে স্ত্রী মনদা সেই টাকায় শহরে এসে পেটের জ্বালায় গণিকাবৃত্তিকে বেছে নেয়। 'কাক' গল্পে উল্লেখ আছে গ্রাম - ঘরের সংস্কার - নবান্নের সময়ে নতুন চালের রান্নায় ভোজ্য প্রস্তুত করে কাককে খাওয়াতে হয়। মন্বন্তর ও মহামারীর মধ্যেও গ্রামীণ কিশোরী বহু কষ্টে কাকের ভোগ সাজায় কিন্তু কাক আসে না। পথে পথে মৃত শরীর -- কাকের ভোগ চলছে নরমাংসে। গল্পটিতে প্রলয়ের সংকেত স্পষ্ঠ।

গল্পকার প্রবোধ সান্যাল বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন সংগ্রামেই গল্পের প্রধান বিষয় করে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'অঙ্গার' গল্পটি সঙ্গতভাবেই বিশেষ পরিচিত। গল্পের প্রতিবেদনে পূর্ব বাংলার একটি সম্পন্ন, শোভন সংস্কৃতিমান, স্নিগ্ধ আচরণ অভ্যস্ত বাঙালি পরিবার দুর্ভিক্ষের সময় উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাঁচার তাড়নায় মনের সংস্কৃতি কালিমালিপ্ত। কিশোর ছেলে চুরি করে, কিশোরী মেয়ে মায়ের প্ররোচনাতেই মেস-বাড়ির পুরুষদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে ও বিনিময়ে টাকা বা আধুলি সংগ্রহ করে। যুবতী মেয়েটির কাছে আসে যুদ্ধের 'এসেনশিয়াল সার্ভিস'-এর লোক। এইভাবে যুদ্ধ তার কলুষ নিয়ে ঢুকে পড়ে উদ্বাস্তু মানুষের অন্তঃপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এমনই একজন গল্পকার যিনি শিল্প প্রতিভা ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেলাতে পেরেছেন এক দেহে। 'দুঃশাসনীয়' গল্পে আমরা লক্ষ্য করি কাপড় দিতে না পারায় স্বামীরঘর ত্যাগ করে নারী আত্মহত্যা করে। 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' গল্পের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় অফিসে কাজ করে। তার ব্যক্তিগত জীবনে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। কিন্তু ফুটপাথে মানুষকে না খেয়ে মরতে দেখে সে প্রথমে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। সে ভিক্ষের মগ হাতে নিয়ে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ভিখারি হয়ে যায়। এক অসাধারণ মানবিক গুন সম্পন্ন গল্প।

মানিকবাবুর মতোই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্প আমাদের আলোচনার বিষয়ের পক্ষে গ্রহণ করা যায়। গল্পকার 'নক্রচরিত' গল্পে কালোবাজারিদের কালো মূর্তি এঁকেছেন। 'কালো জল', পুষ্কর, দুঃশাসন, হাড় প্রভৃতি গল্পে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ও চোরাকারবারিদের ঘৃণ্য আচরণের চিত্র এঁকেছেন। 'ভাঙাচশমা' গল্পে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি কীভাবে এক শিক্ষককে আদর্শচ্যুত করেছে ও আর এক আদর্শ আঁকড়ে থাকা শিক্ষককে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছে তারই ভাষারূপ। নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার' গল্পে ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণিগত বিভেদ খুব স্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 'কল্কি' গল্পে অন্নাভাবে নারীর শরীর বিক্রয় 'ত্রিশঙ্কু' গল্পে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম ও আত্মহনন বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও 'পলাতক' নামক গল্পে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে গল্পকারের। গল্পে বেকার তারাপদ সৈনিকের চাকরি নিয়েছে এবং যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে তারাপদ শিহরিত

হয়ে উঠেছে। এই গল্পেই জোসেফ নামে এক সৈনিক শিশুর দোহাই দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে। কারণ তারাপদ ও জোসেফ তাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া যুদ্ধে এক জার্মান সৈনিকের মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলতে পারেনি।

এছাড়াও সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩' গল্পে চোখে পড়ে মৃত শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে মা চলে যায় নারীমাংসলোভীর পিছনে কেবল পয়সা ও খাদ্যের প্রত্যাশায়। সুশীল জানার 'কুকুর' গল্পে ইসলাম চালের গুদাম পাহারা দেয় আর পথের কুকুর মারে। অন্যদিকে ক্ষুধাজীর্ণ মানুষ চাল চুরি করে কিন্তু দুর্বল শরীরে তা বহন করতে না পেরে পড়ে গেলে কুকুরের দল এসে তাকেই খেতে শুরু করে। টর্চের আলোয় সে দৃশ্য দেখে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে ইসলাম। মানুষকে মারবে ? না কুকুরকে ? এই রকম শিহরণ জাগানো গল্প শান্তি ভাদুড়ীর (মিত্র) 'কিউ' গল্পটি। গল্পের দুটি চরিত্র এক দরিদ্র দম্পতি ও একটি কুড়ানো শিশু। অপুষ্টি ও রোগে শিশুটি অর্ধমৃত। এর মধ্যে বাড়িতে অনেকদিন পর একটু ভাত ফুটছে। রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি মারা যায়। ভাতের ভাগ দিতে হবেনা জেনে পুরুষটি স্বস্তি পায় ও দ্রুত ভাত খেতে থাকে। সরল ভঙ্গিতে লেখা গল্পটির আবেদন পাঠক মনকে সত্যি নাড়া দেয়। সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাকে' গল্পের ধ্রুবেশ সিঙ্গাপুরে বোমা পড়ার পর দেখতে পায় --- "হাজার লোকের জীবন্ত ধড় ছিটকে পড়লো হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে।" সে সঙ্গে সে আরও ভাবে সব যুদ্ধই মানবতা বিরোধী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী, মানবস্বার্থ বিরোধী অত্যাচারের অবসানের সূচক এই যুদ্ধ। হয়তো ভুল ভাবেনি ধ্রুবেশ। যুদ্ধ প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের দুটি গল্প 'ক্ষুধা' ও 'দুর্বোধ্য'। 'ক্ষুধা' গল্পে দুই ভাইয়ের সম্পর্ক চাল না মেলার জন্য তিক্ত হয়ে ওঠে। বড় ভাইয়ের নিঃসন্তান স্ত্রী ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বিপৎকালে কিছু চাল দিলে দুই ভাই-ই বিরক্ত হয়। ছোটভাই স্ত্রী নীলুকে নির্মম ভাবে প্রহার করলে তার মৃত্যু হয়। পরে অনুতপ্ত দুই ভাই-ই আত্মহত্যা করে। 'দুর্বোধ্য' গল্পে এক অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষা না পেয়ে চালের দাবিতে মিছিলে যোগ দিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তার মৃত্যু হয়। এছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'নয়নচারা', ননী ভৌমিকের 'কাফের', 'খুনীর ছেলে', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'নীলচোখ', সুলেখা সান্যালের 'পঙ্কতিলক', বিভা বিশ্বাসের 'ভাঙা হাতল' গল্পগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু মানুষের জীবনের করুণ পরিণতি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করবো ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু মানুষের বাস্তব পটভূমি বাংলা ছোটগল্পের নিরিখে। এখানে স্মরণীয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, মন্বন্তর, কালোবাজার, কালোটাকা, অনতিপর দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তারই পরিণতি ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশভাগ। ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তী প্রায় আড়াই দশক কাল ধরে উভয় বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের টালমাটাল অবস্থাই মুখ্য হয়ে উঠে সাহিত্যের

পাতায় পাতায়। বাংলা ছোট গল্পও এর ব্যতিক্রম ছিলনা।

উদ্বাস্তু জীবনের মানবিক সম্পর্কের আমূল রূপান্তর নিপুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন উর্দু লেখক রাজিন্দার সিং বেদী তার 'লাজবন্তী' গল্পে। গল্পের নায়ক সুন্দরলাল দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লুধিয়ানায় চলে আসে। তার স্ত্রী লাজবন্তী অপহৃতা হয়েছে। স্ত্রীকে হারিয়ে সুন্দরলাল তার জীবনের শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে চায় উদ্বাস্তুদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে। "...... আপনার হৃদয়ে এদের পুনর্বাসিত করুন" ---- এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয় সুন্দরলাল। সারভাইয়ের উদ্যোগে সুন্দরলাল স্ত্রীকে ফিরে পেলেও অপহৃতা স্ত্রীকে সে স্ত্রী নয় দেবী হিসেবে দেখেছে। অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে অপহৃতা স্ত্রীকে সুন্দরলাল পুনর্বাসিত করতে পারেনি। যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মানবিক ব্যর্থতা।

উদ্বাস্তু জীবন সৃষ্ট বহুবিধ সমস্যা নিয়ে অসাধারণ গল্প লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী। তার 'অধিরথ সূতপুত্র' গল্পের সনাতন উদ্বাস্তু হয়ে চাকরি না পেয়ে নিজেকে কুলপরিচয় শূন্য জারজ সন্তানের মতো মনে করে। তার স্বদেশ নেই। যেখানে সে থাকে (কলকাতা) তার কাছে তা বিদেশ। এখানে প্রেম নেই ভালোবাসা নেই, মনুষ্যত্ব নেই। শেষ পর্যন্ত শশধর মিত্রের চক্রান্তের শিকার হয় সনাতন। চক্রান্তের শিকার হয়ে সনাতন তার নিজের বুকের রক্ত দিয়ে যেন এপিটক রচনা করে --- "বুঝিয়াছি আমার স্বদেশ নাই ...... পৃথিবীর কোন মাটির কাছে ভিক্ষা চাহিয়াও বাঁচিবার অধিকার পাই নাই। স্বদেশহীন মানুষের স্থান এই মর্তভূমি কি করিয়া হইতে পারে।" এই বোধ সনাতনকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। 'ইছামতী বহমান' গল্পের মৃন্ময়ী দেশভাগের সময় হারিয়ে যায়। এক উদ্বাস্তু পরিবার তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। মৃন্ময়ী বড় হয়েছে, সুখে আছে কিন্তু সে জানে না এই পরিবারের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক আছে কি, নেই। এরই মধ্যে মৃন্ময়ীর বাবা শ্রীদাম মালাকার (কেরানিগঞ্জ থানা, ঢাকা সদর) একুশ বছর পর মেয়ের খোঁজ পায়। কারণ দেশভাগের পর মালাকার পরিবারও ভারতে চলে আসে। মৃন্ময়ীর প্রকৃত নাম পারুলরানী। এক অজানা আশঙ্কায় মৃন্ময়ী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ সে নিজেই জানে না সে পারুল না মৃন্ময়ী ? কে তার বাবা ? শ্রীদাম না যাকে সে একুশ বছর ধরে বাবা বলে জেনেছে ? দেশভাগ মৃন্ময়ীকে গভীর সংকটে ফেলেছে, জীবনের ছন্দ সে হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ইছামতী পূর্বের মতোই বহমান। সমস্যা সংকট শুধু উদ্বাস্তু মানুষের।

দেশভাগের ফলে সাদাত হাসান মান্টোর 'নিয়তি' গল্পের নায়িকা নাসিম আখতারের স্বপ্ন ও চিরকালের মতো অপূর্ণ থেকে গেছে। নাসিম দিল্লীর বিখ্যাত বাইজী। স্বাধীনতা লাভের পর নাসিম দিল্লী ত্যাগ করে। পালিয়ে যায় পাকিস্তানে। আশ্রয় নেয় লাহোরের ওয়াল্টার মোহাজির ক্যাম্পে। কিছুদিন সেখানে থাকার পর নিজের সোনার গয়না বিক্রি করে এক ভদ্র পাড়ায় চলে আসে। নাসিম তার বৃত্তি ত্যাগ করে ঘর বাঁধতে চায়, স্বামী

চায়, সংসার চায়। প্রতিবেশী এক দুঃশ্চরিত্র মহিলার প্ররোচনায় নাসিমের বিয়ে হলেও পরক্ষণে নাসিম জানতে পারে তার স্বামী তাকে বিক্রি করে দিবে, তখন সে স্বামীকে ত্যাগ করে আবার তার পুরানো বাইজীবৃত্তিতে ফিরে আসে। অর্থাৎ দেশভাগ নিয়তির মতো আবির্ভূত হয়ে নাসিমের স্বপ্নকে তচনছ করে দেয়।

সশস্ত্র সংগ্রামের অঙ্গীকার নয়, মানসিক শক্তির সাহায্যে উদ্বাস্তু জীবনের নানাবিধ সমস্যাকে জয় করার দৃঢ় সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গল্পে। তাঁর 'উপায়' গল্পে উদ্বাস্তু নারী মল্লিকার পবিত্র ও সাহসী মনোভাব এবং তথাকথিত উদ্বাস্তু-দরদী ভদ্রলোক প্রমথর চারিত্রিক নীচতা বর্ণিত। সাহায্য করার নামে প্রমথ মল্লিকাকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। মল্লিকা তাকে হত্যা করে টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে। অথচ কোন অপরাধ বোধ জন্ম নেয়নি মল্লিকার মনে বরং প্রমথর মটো পুরুষদের প্রলুব্ধ করে অর্থ সংগ্রহ করার এবং বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেয়েছে মল্লিকা। অন্যদিকে 'সুবালা' গল্পে সুবালার স্বামীও ছিনতাই করে ক্ষুধা দূর করেকে অন্যায় মনে করে না। বরং ভিক্ষে করে বেঁচে থাকাই তার কাছে মৃত্যুর সামিল। ফলে ছিনতাইয়ের অপরাধে সুবালার স্বামীকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তখন স্ত্রী সুবালার প্রতি তার উক্তি "ভিখ মাইগো না। আমাগো অপরাধ নাই, ভিখ মাইগা অপরাধী সাইজোনা। তার চেয়ে মরণ ভালো।" কারণ সুবালার স্বামী জানে যেখানে অন্যের অপরাধে দেশভাগ হয়েছে, তাদের স্বর্বস্ব হারাতে হয়েছে, উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, মানুষের করুণায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে, সেখানে ছিনতাই করাটা অপরাধের নয়। যদিও তারা ইচ্ছা করে ছিনতাই করছে না, ছিনতাই করছে অভাবের তাড়নায়। এছাড়াও "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই" গল্পে এক বৃদ্ধ উদ্বাস্তু মহিলা সব হারিয়ে কলকাতায় এসেছে। কিন্তু বিশাল কলকাতা তার আশ্রয়ের পক্ষে ক্রমেই ছোট হতে থাকে। কিন্তু মহিলা ভেঙ্গে পড়েনা বরং শপথের উচ্চারণে বলে --- "এত বড় পৃথিবীতে মাথা গোঁজনের ঠাঁই আদায় কইরা নিমু।" যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সংগ্রামী জীবনের ইতিকথা।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মর্যাদা' গল্পটির কথা। গল্পে দরিদ্র পণ্ডিত মশাই দেশবিভাগের ফলে সব হারিয়েছেন, কিন্তু আত্মমর্যাদা হারাননি। আর হারাননি ফেলে আসা দেশের প্রতি ভালোবাসা। অভাবে-অভিযোগের মধ্যে থেকেও ছাত্রকে তিনি তাঁর দুঃখের কথা বলেছেন এইভাবে --- "আছিরে, ভালোই। শুধু বুড়ো বয়সে দেশের জন্যে একটু কষ্ট হয়, আরতো কখনো পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারব না।"

শিয়ালদা ইস্টিশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে রেলগাড়ির পর রেলগাড়ি এসে ঢেলে দিচ্ছে উদ্বাস্তু মানুষ। এরা আহূত ? না রবাহূত ? তাও না। সম্পূর্ণ অনাহূত। 'এরা ফরেনার'। এই স্টেশনেই ঘুরে বেড়ায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শুল্ক' গল্পের চম্পা। অবৈধ পণ্য পাচারের ব্যাপারে কাস্টমস্ বিভাগকে ফাঁকি দেবার জন্য সে যে কোন অজানা লোকের বউ সাজতে রাজি। তাঁরই 'পালঙ্ক' গল্পে দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু

শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার এক পুত্রবধূ ওপারে থাকা তার শ্বশুরকে চিঠি লেখছে এই ভাষায় ----- "..... কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করার জন্য আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলাঘাটার যে ঘর আমরা ভাড়া নিয়েছি তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেওয়াল আর মেঝে থেকে দিন রাত জল চুঁয়ে চুঁয়ে উঠছে। সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে কানু, টেনু, মীনা আপনার অত আদরের নাতি নাতনীদের কারো অসুখ বিসুখই আর সারছেনা ...... আপনার ছেলের কাছে খাট তক্তপোশের কথা বললে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। বলেন টাকা কোথায় ? তা আমি বলছি কি, আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানি আপনি এবার বিক্রি করে দিন। দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান। আমি খাট পারি, তক্তপোশ পারি যা হোক আপনার নাতি নাতনীদের জন্য কিনে নিই।" চিঠির বয়ানে ফুটে উঠেছে দেশভাগের ফলে দারিদ্র্য জীবন যন্ত্রণার ছবি। ঠিক এই গল্পেরই প্রতিধ্বনি স্বরূপ দেবেশ রায়ের 'উদ্বাস্তু' গল্পে সত্যব্রত, অনিমারা ওপার থেকে এপারে এসে প্রশ্ন তুলেছিল ------ 'আমি কে ? আমরা ? বাস্তুহারা ? উদ্বাস্তু ? আশ্রয়প্রার্থী ? শরণার্থী ? ছিন্নমূল ? বহিরাগত ? ফরেনার ? বাঙাল ? রিফ্যুজি ? কী তাদের পরিচয়। অর্থাৎ দেশভাগ মানুষের আত্মপরিচয়, বংশ পরিচয় তথা জাতি সর্বস্বতাকেও কেড়ে নিয়েছিল সেইদিন। তাই তো শরণার্থী শিবিরে যে সত্যব্রত লাহিড়ী নামে পরিচিত হয়েছিল পিতা মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ী, আদি নিবাস পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে ২৩০/এ/৬ হোল্ডিংস্থ মোকামে বাস। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় সে আসলে শেখ মনসুর আলি, পিতা মৃত কদম শেখ, হাল সাকিন রায়চর, জিলা পাবনা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বরাজ রেলে' গল্পের রেল কর্মচারী কুমুদবন্ধু, দেশভাগের পর উত্তর প্রদেশের শীতার্ত স্টেশনে আট চাকার এক মালগাড়িতে পরিবারসহ আশ্রয় পেয়েছে। একদিন হঠাৎ দেখে মালগাড়িটি নেই, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পরিবারের সন্ধান না পেয়ে যখনই উদ্‌ভ্রান্ত পাগল প্রায় কুমুদ, ঠিক তখনই তার দিদির একটি চিঠি পেয়ে কুমুদ জানতে পারে তার পরিবার আবার পাকিস্তানে ফিরে গেছে। সেখানে এখন দাঙ্গা নেই। মুসলমানরা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া অম্বিকারাও আসাম থেকে ফিরে এসেছে। কুমুদ যেন রেলের চাকরি ছেড়ে পাকিস্তানে ফিরে যেয়। আসলে ফেলে আসা দেশের স্মৃতির টানেই ফিরে যাওয়া, দেশকে ভালোবাসার এক অনন্য গল্প 'স্বরাজ রেলে'। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' গল্পে মুনাফাবাজেরা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে গণ্য করে সেই দুঃসময়ে নাগরনদীর এপার ওপার দুদিক থেকে সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা ভাঙিয়ে পকেট ভারি করেছেন। বিপন্ন উদ্‌ভ্রান্ত মানুষজনের 'উপকার' করার জন্য মুমিমজী তাদের বসতবাড়ি পাকিস্তানে পড়ছে শুনে আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী নাগরনদীর পুর পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে চলে আসছে দলে দলে ছেলে-মেয়ে-গরু-ছাগল। হাড় জিলজিলে কালাজ্বরের রোগী চলছে বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ি - পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা যাওয়ার যাবে যাবে ভাব। এরই মধ্যে

দর্পণ সিং-এর স্ত্রী আপন মনে বকে চলে --- "লকলকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে একদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি। সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া খেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল না কি. কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল। চ্যালা কাঠ দিয়ে আসবার সময় উনুনটা ভেঙ্গে দিয়ে এলাম। কি সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম -- তাতে রাঁধবে কিনা এরফানের চাচী।" এই যে আবেগ তা আসলে দেশভাগের কারণে জাতির প্রতি বিদ্বেষ, যে বিদ্বেষ আজও সব উদ্বাস্তু হিন্দুদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পে দেখি মানবিক অস্তিত্বের সংকটে আধুনিক লেখক মিথকে নানাভাবে ব্যবহার করেন। গল্পে ছিন্নবাহু নেত্যচরণের নৃত্যের ঠামে রামায়ণের এক বিপন্ন মুহূর্তের স্মৃতি ভেসে ওঠে। দেশভাগ, ঘাতক, অগ্নিকাণ্ড -- দুর্গার স্মৃতিকে আলোড়িত করে নেত্যচরণের ছিন্নবাহু অবস্থায় ধুনুচিনাচ দেখতে দেখতে। ফলে উদ্বাস্তুদের নিয়ে দুঃখবিলাস নয়, বরং জটায়ুর লড়াই আর নেত্যচরণের কঠিন ক্রোধ আত্মসমালোচনা, সব মিলিয়ে সত্যই মনে হয় রামায়ণের সেই বীর বিহঙ্গ বুঝি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সীতার জন্য সংগ্রাম আর দুর্গার জন্য নেত্যচরণের আবেগ এখানে একীভূত। এখানে ভিটেহারা নেত্যচরণ আর ডানাছাঁটা জটায়ু এক ভূমিকায় আর্ত অথচ অদম্য।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের কাছে দেশবিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা তাদের কাছে ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা, একবার ইংরেজের শাসন থেকে, সঙ্গে একদিনকার চেপে বসা হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। তাই দেশভাগের ক্ষতির চেয়ে তাৎক্ষণিক শ্রেণিগত লাভটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাদের চোখে। সেই সঙ্গে লেখকের রচনায়ও দেশবিভাগের বেদনা ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সমস্যার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল "নবীন পাকিস্তানকে সব পেয়েছির দেশে পরিণত করার স্বপ্নকল্পনা।" তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' গল্পে। পূর্ণ গর্ভবতী পুষ্পিতা, স্বামী আলি আহমেদের সঙ্গে রেলগাড়িতে করে পাকিস্তানে পালাচ্ছেষ সদ্যোজাত শিশুর নাম হবে প্রতীক আহমেদ, পাকিস্তান জন্মের প্রতীক। এই আশাবাদ পূর্ববাংলার দেশভাগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

তবে একথা সত্য যে, পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুদের তুলনায় সংখ্যায় যত কমই হোক, তবু বেশ কিছু বাঙালি মুসলমান পশ্চিম থেক পূর্ববাংলায় চলে গিয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের 'মড়ক' গল্পে ইজরাইল পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে লম্পট প্রমথ-র প্ররোচনায় দাঙ্গা লাগলে মুসলিম পরিবারকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। 'কৃষ্ণযোলই' আগস্টে কলকাতায় দাঙ্গা লাগলে, শেষবারের মতো

প্রিয় বিদ্যায়তন মিত্র ইনস্টিটুশনের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে মীজানুর রহমানকে শেষ পর্যন্ত কমলালয়া কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়। অন্যদিকে ফাটা-দেশ নিয়ে বেদনায় পীড়িত হয় হাসান আজিজুল হকের 'একটি নির্জলা কথা' গল্পের সব হারানো নারী। 'কুন্ দোজখিরা দ্যাশ ভেঙেছে, তাতে আমার কী ?' গলায় দড়ি বেঁধে অনিচ্ছুক তাকে যেন টানতে টানতে পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে।"

রমেশ সেনের 'পথের কাঁটা' গল্পে দুটি সমান্তরাল মিছিলের কথা আছে। একটি মিছিল চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অন্যটা বিপরীত দিকে। "সামনে আসিয়া একদল আরেক দলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই ? এ করল কে ? কারা ?" লেখক আসলে দাঙ্গার মধ্যেও মানুষের মধ্যে মানবিকবোধকেই জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মনোজ বসুর 'এপার - ওপার' গল্পে দেশত্যাগী হিমাংশুর মাঠের ধান তাজ মহম্মদ দখল করেছিল। দেশে গেলে হিমাংশুকে অবাক করে সে তাকে ধানের দাম হিসেবে ১০০ টাকা দিলে পক্ষান্তরে হিমাংশু সেই টাকা দরগা বানানোর জন্য গোলাম আলিকে দিয়ে দেয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পে একসঙ্গে খেটে খাওয়া মজুর জহুরালি আর দীননাথ ইট আর সোডার বোতল নিয়ে দাঙ্গায় নামে। গল্পের শেষে মিলিটারির ভয়ে বিরোধী দুইজনে আশ্রয় নেয় এক বাড়ির সিঁড়ির নীচে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের সরল সমাধান হয়ে যায় যখন একজনের বিড়ি আর অন্যজনের দেশলাই কাছে আনে দুজনকে। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পেও সুতামজুর আর নৌকার মাঝি, একজন হিন্দু আর অন্যজন মুসলমান, বিড়ির টানে মিলে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যের 'ইজ্জৎ' গল্পেও একই ভাবে উপস্থাপন। সেখানে জগন্নাথ সরকার নমশূদ্রের পুরোহিত, ঢাকাতে কালীর পূজক। কালীর মন্দির আর ফকিরের মাজার এতদিন শান্তিতে পাশাপাশি ছিল। দাঙ্গার দিনে এই পাশাপাশি থাকাটাই হয়ে ওঠে অশান্তির কারণ। কিন্তু গল্পকার দুজনকে মিলিয়েছেন জগন্নাথ আর ধলামগুাই দুজনের স্ত্রীরই পরনের কাপড়ের অভাব। হাবিব মিয়ার সদ্য সমাহিত ছোটবিবির কাপড় চুরি করতে গিয়ে তারা দুজনে মিলে যায়। আসলে শত্রুকে ওরা আঘাত দিতে শেখেনি, শিখেছে শুধু আত্মঘাত।

অনেকটা বাস্তব সত্যের গল্প গৌরকিশোর ঘোষের 'যাহা যায়'। গল্পে দাঙ্গার দুর্যোগ মুসলমানের দোকানে ঢুকে আশ্রয় নেয় রানু। কেউ কারও উপর আস্থা রাখতে পারছে না বলে দোকানের আলো নেভাতে পারছে না। ফলে শামাপোকার কামড়, তথা অবিশ্বাসের কামড় খেয়েই চলেছে দুজনে। আবার তত্ত্ব আর সত্য চমৎকারভাবে মিলে গেছে প্রফুল্ল রায়ের 'মাঝি' গল্পে। নিজের বিয়ের টাকা জোগাড়ে ব্যস্ত ফজল বাড়তি উপার্জনের সুযোগ পেয়ে যায় যখন ইয়াসিন এক হিন্দু মেয়েকে তার নৌকায় তুলে চর ইসমাইলের দিকে যেতে উদ্যগী। অপহৃতা মেয়েটিকে ইয়াসিন খোদ বেগম বানাতে চায়। ছইয়ের ভিতর থেকে আক্রান্ত মেয়েটি যখন তীব্র

অমানুষিক চিৎকার করে ওঠে, তখন সেই চিৎকার "ফজলের শিরা, স্নায়ু মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধি গেল যেন।" সব ভাবনা হিসেবে ভুলে যায় ফজল, আর তার কোঁচ অব্যর্থ লক্ষ্যে ইয়াসিনের দিকে ছুটে যায়। দিনেশ রায়ের 'কুলপতি' গল্পে চারপুরুষের কুলদেবতা কালাচাঁদ, শ্বশুর ও স্বামীকে নিয়ে যে বধূটি দেশ ছেড়েছে সেই কালাচাঁদকে অনাহারী রেখে নিজেরাই খেয়ে নেয়, ভুলে যায় তাদের এতদিনকার নিয়মও সংস্কার। অথচ এই কালাচাঁদের নামেই দেশে তাদের জমিদারীর শাসন চলতো। সমরেশ বসুর 'পশারিণী' গল্পে নিরাপদ মাস্টারের মেয়েকে দেখি ট্রেনে পুতুল হকারি করে বিক্রি করে। দেশভাগের এই বাস্তবতা খুব কম গল্পেই উঠে এসেছে।

বলার কথা যে, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ যখন সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যায়, তখন তারা 'Remain suspended hanging between the two worlds'। একদিকে স্মৃতির মধ্যে থেকে যায় ছেড়ে আসা অতীত, অন্যদিকে বর্তমানে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, জীবন, বিশুদ্ধ বাঁচার মৌলিক তাগিদে তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত হয়ে আসা মানুষেরা নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী আশ্রয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। অবস্থাপন্নেরা জমি কিনে বাড়ি করে নিল, কেউ জবরদস্তি দখল করে, বা বিনিময় করে নিল পূর্ব বাংলায় চলে যাওয়া মুসলমানদের বাড়ি, কেউ আশ্রয় নিল পরিত্যক্ত সামরিক ছাউনিগুলিতে গড়ে ওঠা সরকারি শিবিরে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠলো উদ্বাস্তু শিবির। কিন্তু দেশভাগ - দেশত্যাগ নিয়ে লিখলে পাছে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পেয়ে যায়, সেই ভয়ে বাংলা সাহিত্য কিছুটা মুখ ফিরিয়ে ছিল। বা সব কথা বলা যায়না কিংবা সব কথা বলা সম্ভব নয় বলেই হয়তো অনেক বাস্তবই রয়ে গেছে যা লেখকদের কালো চশমার ফাঁক এড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক যথার্থই উল্লেখ করেছেন --- "দেশভাগ - দেশত্যাগে মানুষকে যখন হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে --- আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।" [৭] এই নীরবতার কারণ সম্পর্কে আশিস নন্দী মনে করেন ----- "আমাদের imagination of evil failed to cope with it ?" সেই কারণেই কি এই মৌন ? স্বাধীনতালাভে সুখী মধ্যশ্রেণি হয়তো নিজেদের চেতনা থেকে এই গণহত্যার হিংস্রতাকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল তাই ---" [৮] হয়তো এটাই সত্যি।

(ঘ) বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু ভাবনা ঃ—

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতি বিদ্বেষ, দেশ-বিভাজন প্রভৃতি অভিশপ্ত ঘটনার ফলে আধুনিক কালে যেমন মানুষ বেশিসংখ্যায় উদ্বাস্তু হয়েছে। তেমনি উদ্বাস্তু-জীবনাশ্রিত উপন্যাসও কম লেখা হয়নি। সেই সব উপন্যাসে বাস্তুত্যাগের উল্লেখমাত্র নয়, তার বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়তা, ফেলে

আসা দেশ-গ্রাম-মানুষের জন্য বেদনা এবং অপরিচিত প্রতিকূল পরিবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর সংগ্রাম অথবা সর্ববিধ পতন নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তি অথচ সর্বব্যাপী সহানুভূতির সঙ্গে আধুনিক কথাকাররা ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'পদচিহ্ন' গ্রাম ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ---- "অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, বিদেশে দিয়া অনাহারে মরিল।" দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের এধরনের হাজারো সমস্যা ও ফেলে আসা বাস্তুভিটার প্রতি টান, আমরা দেখব বাংলা উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায়, জাপানি বোমা পড়ার আশঙ্কায় দলে দলে মানুষ কলকাতা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চায়। বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তন' উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে সেই উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যদুবাবুর এক বন্ধু বলছে --- "আমার আবার বাড়ীর সবাই চলে যাচ্ছে মধুপুর .... এরপর রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে। ...... কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখগে লোকের ভিড়।" আবার যদুবাবুর স্ত্রী বললে ---- "হ্যাঁগো হিম হয়ে তো বসে আছ --- এদিকে ব্যাপার কী শোনোনি ? আজ রাত্রে নাকি জাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়। বাড়ীওয়ালারা সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ীর মটরের বউ মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়ীতে।" এই যে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার তোড়জোড় তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে 'উদ্বাস্তু' নামক বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাবহুল শব্দটি। এছাড়া বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, নিঃসঙ্গতা, নিরন্নতায় গৃহহীন মানুষগুলির বাস্তবতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে। তিনি উল্লেখ করেছেন --- "গাঁয়ে কোথাও একদানা চাল নেই .... কায়েত পাড়ার সুন্দর সুন্দর বৌগুলি পর্যন্ত সব শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে।" কিংবা "ইঁদুরের মত নিরাশ্রয় মানুষেরা দলে দলে কলকাতার চড়ায় এসে ঠেকেছে। ...... এক অফুরান অন্ত্যেষ্টির মিছিল। ... শকুনের ঝাঁকের মত একদল স্ত্রীলোক পচা ফলের উপর লাফিয়ে পড়ে নিজেদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।" আসন্ন মৃত্যুর বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন ---- "...... পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিঃশ্বাসের স্পন্দন এখনো লুকোচুরি খেলছে।" পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এই বীভৎস মৃত্যুস্রোত বর্ণনা, মাঝে মাঝে লঙ্গরখানার জলো খিচুড়ির ছিটে দেওয়া --- কখনো কখনো পাঠকের শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। অন্যদিকে মন্বন্তরের ফলে নিঃসঙ্গ মানুষরা যখন একটু আশ্রয়ের সন্ধানে ঘর ছেড়েছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছিন্নতা। খাদ্যের জন্য হানাহানি। থাকার জন্য কাড়াকাড়ি, কাপড়ের জন্য মারামারি এর কোনটাই বাদ পড়েনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রাত্রি' উপন্যাসে। ধনী, কারখানা মালিক মহীতোষ পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলে ----- "...... পূজোর ছুটিতে এখানে থাকা চলবে না -- যা শুরু হয়েছে, কলকাতায় থাকা মুস্কিলই হয়ে উঠবে .... ভিখিরির ভিড় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। ফুটপাতে চলা মুস্কিল ওদের জ্বালায়। হাঁড়িকুঁড়ি, মসলা, মগ, কাঁথা, মাদুর নিয়ে দিব্যি সংসার জাকিয়ে বসেছে একেকজন।" পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ মনে হয় প্রবীরের নিষ্ক্রিয়তায়। লেখকের ভাষায় ---- "কাদের পায়ে শৃঙ্খলা আনতে চায় প্রবীর ? মৃত্যুপথ যাত্রীদের পায়ে ? কবরের পাশে অপেক্ষা করছে যারা, তাদের পায়ে

কিসের শৃঙ্খলা চায় সে ? মৃত্যুর অপেক্ষায় তারা সুশৃঙ্খল। জীবনের জন্যে আর নয়।" সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই বর্ণনা যেন তৎকালীন উদাসীন বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের প্রতি কিছু শ্লেষধর্মী।

সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসের নায়ক মেঘুসাহা। পূর্ববঙ্গের মাটি থেকে উৎখাত হয়ে চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। মেঘুর মনে গাঁথা আছে দেশ বিভাগের ক্ষত। কেননা দেশভাগের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমান সাহেব মেঘুকে কলকাতায় চলে আসার পরামর্শ দিল (কলকাতায় চলা যান) এ কথায় মেঘুর পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। উৎকণ্ঠায় উদ্দীপ্ত চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার। তার তিলে তিলে গড়া রক্তস্তম্ভটায় যেন শাবলের ঘা পড়ল। এরই মধ্য চলে যাওয়ার ব্যবস্থা। জীবনের আকাঙ্খা, যৌবনের উন্মাদনা যে মহলের পর মহল গড়ছে, তুলতে গেলে সে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কুটিল সন্দেহে ভ্রূ আড়াল দিয়ে দেখল সে সাহেবদের দিকে "তাড়িয়ে দিতে চায় নাকি তাকে মুসলমান সাহেব।" এখানেই সত্যি হল মেঘুর দেশভাগ। তারাশঙ্করের 'বিপাশা' উপন্যাসে কিশোরী বিপাশাকে নিয়ে অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা পুত্রবিয়োগ পার হয়ে সর্দারজী যখন হিন্দুস্তানের মাটিতে পৌছলেন তখন তিনি সব উদ্বেগের অবমানে বলে উঠেছিলেন ---- 'অলখ নিরঞ্জন'। এই অনুভূতিতে ভুল ছিলনা। কেননা তখন অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষকে একদিক থেকে আর একদিকে দিয়ে হয়তো এই অনুভূতিকেই জড়িয়ে নিয়েছে। আবার সমরেশ বসুর 'খণ্ডিতা' উপন্যাসে দেখা যায় সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট এদিক থেকে দুজন ওদিকে চলেছে উৎসভূমির সন্ধানে। একজন আরেক জনকে বলছে ----- "আসবো, চিরকাল আসবো" ----- সতু মোতির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো ---- "এই জমিনেই যেন আমি চিরকাল জন্মাই।" সতুর কাছে এই দেশ খণ্ডিতা হলেও সুন্দর।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'নীল আগুন' উপন্যাসটিতে নিটোল কাহিনির সঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের সমস্যা ও কারুণ্যের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। তিনটি ভদ্র পরিবারের তরুণী মেয়ে (অঞ্জনা, রঞ্জনা ও খঞ্জনা) দেশবিভাগের পর কিভাবে অধঃপতিত হয়ে বেঁচে রইল তারই কাহিনি 'নীল আগুন'। উক্ত তিনজন তাদের সতীত্ব নিজেরা দূষিত করেনি, করেছে সমাজ, সময় ও মানুষ অর্থাৎ দেশভাগ। ফলে শিয়ালদহ স্টেশনে বাসরত ছিন্নমূল মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাপন, উদ্বাস্তু জনতার পারস্পরিক দলাদলি ও চক্রান্ত, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মচারদের দুর্নীতি ও লাম্পট্য প্রভৃতি বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি (২য় খণ্ড) অধিকাংশ স্থান জুড়ে একটি বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারকে (সোনাদের পরিবার) কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, নর-নারীর স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষা, লোকায়ত বিশ্বাস, আচার-আচরণ বর্ণিত হয়েছে স্নিগ্ধ বাচন ভঙ্গিমায়। দেশ বিভাগের পরে সোনাদের পরিবার ও উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এরই

সূত্র ধরে উপন্যাসে এসেছে উদ্বাস্তু জীবন। উপন্যাসটির ২৫৩-২৭২ এবং ২৮১-২৯২ পৃষ্ঠায় প্রাক্ উদ্বাস্তু জীবন ও উদ্বাস্তু জীবন আলোচিত। রক্তের গভীরে দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি যে মমত্ব জীবনকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে, বিদেশে স্নেহ প্রীতি বিবিক্ত অচেনা পরিবেশের মধ্যে জীবনের সেই স্বাভাবিকতা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই যন্ত্রণাই সোনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছে। জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি, সমুদ্রের জীবন, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, রাজবাড়িতে কর্মগ্রহণ, মা-বাবা-স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব এবং সম্পর্কের শৈথিল্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনা সোনার জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে। সোনার অতীত ও বর্তমান, স্মৃতি ও সত্তা, সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন উদ্বাস্তুজীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে দমদমের একটি কলোনিতে আশ্রয়প্রাপ্ত ছিন্নমূল মানুষদের পুনরায় উদ্বাস্তু করতে দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় অর্জুন। ফলস্বরূপ উপন্যাসটি ত্রি-স্তরীয় কাহিনি বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। অর্জুনের কাহিনী, অর্জুন-বিরোধী শক্তির উত্থান এবং লাবণ্য, বিশ্বনাথ ও উদ্বাস্তু জনতাদের নিয়ে আর একটি স্তর। সেই বিন্যাসের সূত্র ধরেই উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা-বেদনা-গ্লানি-আর্থিক দৈন্য যেমন কাহিনি চিত্রে উঠে এসেছে তেমনি অর্জুনের চিন্তায় বিশাল পটে বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে একদল নির্ভূম, নিঃস্ব মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অদম্য উৎসাহ বর্ণিত হয়েছে। উত্তর আন্দামানের সমুদ্র-অরণ্য অধ্যুষিত, জনমানবশূন্য অঞ্চলে (ভিগলিপুর) বাস্তুচ্যুত মানুষ পাঠানো হয়েছে বসবাসের জন্য, সেই অপরিচিত পরিবেশে জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার মধ্যেই উদ্বাস্তু জীবনের নানা বৈচিত্র, আনন্দ-বেদনা ধরা পড়েছে কাহিনিবৃত্তে।

(ক) বাসিনী ও রসিকের বৃত্ত -- এই বৃত্তের বাসিনী সর্বত্র বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে, বেঁচে থাকার কথা বলছে। বাঁচার লড়াইয়ে সে হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

(খ) নিত্যঢালী ও কাপাসীর বৃত্ত -- এই বৃত্তে দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন ও রক্তক্ষরণ দেখানো হয়েছে। কাপাসী ধর্ষিতা হয়ে উন্মাদিনী হয়েছে। তার পিতা নিত্য নির্বিকার ও নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে।

(গ) রামকেশব ও ক্ষিরির বৃত্ত -- দেশ বিভাগের ফলে পুত্র-কন্যা হারিয়ে ক্ষিরি সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েছে। স্নেহ-প্রেম-কোমলতা তার হৃদয় থেকে লুপ্ত হয়েছে।

(ঘ) হরিপদ বারুই ও তিলির বৃত্ত -- এই বৃত্তে উদ্বাস্তু জীবনের অবৈধ প্রেম দর্শিত হয়েছে।

(৬) হারাণ ও উজানী বুড়ীর বৃত্ত -- উদ্বাস্তু যুবকের নিঃস্বার্থ প্রেম-ভালোবাসা এবং আজন্মলালিত সংস্কার বিশ্বাস এই বৃত্তে লক্ষ্য করা যায়।

নারায়ণ সান্যালের 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাসটি উদ্বাস্তু জীবনের দলিল। কাহিনি পটে তিনি উল্লেখ করেছেন --- "পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি-সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এল। দশ পনেরো বছর ধরে স্রোতের জলে ভেসে ভেসে বেড়াল -- শিকড় গড়াল না কোথাও।" সত্যিই তো দণ্ডকারণ্যের রুক্ষ ও আরণ্যক পরিবেশে বাস্তুহীন মানুষের পুনর্বাসন ও জীবন সংগ্রাম সর্বোপরি তাদের জয়যুক্ততার পূর্বাভাস দিয়েছেন উপন্যাসে। যশোর জেলার কমলপুর গ্রামের মানুষ দেশভাগের বলি হয়ে যাযাবরের মতো ভাসতে ভাসতে অবশেষে দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় পেল। সেখানেও নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কিভাবে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব হলো তারই দীর্ঘ কাহিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও 'বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প' উপন্যাসে উদ্বাস্তু জনতার পরনির্ভরশীল জীবন এবং 'বল্মীক' উপন্যাসে জবরদখল কলোনিতে আশ্রয় পাওয়া ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরেছেন নারায়ণ সান্যাল।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আবাদ' উপন্যাসে পাই একদল বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্গম অঞ্চলে বসবাস ও নানাবিধ সমস্যার কাহিনি। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন উদ্বাস্তু জীবন শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই বিপর্যস্ত হয়নি, শুধুমাত্র অন্ন-অন্বেষণের বিচিত্র পদ্ধতিই উদ্বাস্তু জনতার একমাত্র সমস্যা নয়। তাদের জীবন চর্যায় ও আছে শুভ-অশুভ দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা, ভূমি ও নারীর অধিকার নিয়ে সমস্যা। তবে এই সবকিছুই এসেছে উদ্বাস্তু জীবনের ভেতর থেকেই। উপন্যাস পাঠে জানা যায় বেথুয়াডহরী উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বেশ কিছু গৃহহীন মানুষ স্থায়ীভাবে চলে আসে মুর্শিদাবাদের দুর্গম হিজল অঞ্চলের ঘেরিতে। সস্তায় জমি পেয়ে এখানে তারা বসবাস শুরু করে। নতুন আবাস সৃষ্টি হয়। উদ্বাস্তু জীবনে দেখা দেয় জটিলতা। এরফলেই শুরু হয় শুভ-অশুভর দ্বন্দ্ব। উপেন রায় শুভ এবং চিন্তাহরণ অশুভশক্তির প্রতীক। দুঁজনেই উদ্বাস্তু। নিতান্ত আর্থিক কারণে হরেন, অবিনাশরা চিন্তাহরণের পক্ষ নিয়ে নানা দুষ্কর্ম করে। আর এই শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে উপেন, ললিত ও কপিলরা। সেই সঙ্গে শুভশক্তির জয় ও অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটেছে। উদ্বাস্তু হরেণদের জীবনে নেমে এসেছে আবারও বাস্তুভিটা হারানোর সংকট। এরমধ্যেই ললিতের সন্তান লাভ, পার্বতীর রোগমুক্তি, যতীন ওঝার মৃত্যু উদ্বাস্তু জীবন প্রবাহকে সচল রাখে, 'আবাদ' করে জীবন রক্ষা করে।

শংকরের 'স্থানীয় সংবাদ' একটি যুবতীর আত্মত্যাগের কাহিনি হলেও এতে একাধিক উত্তেজক প্রসঙ্গ আছে যা পাঠকের কাছে লোভনীয়। সত্তর দশকের বৈপ্লবিক প্রসঙ্গ, উত্তাল কলকাতা, শোষিত পশ্চিমবাংলা

উপন্যাসটির প্রেক্ষিত হলেও এর ভিত্তিমূল হল দ্বিখণ্ডিত বাংলা এবং একটি ছিন্নমূল পরিবারের সাময়িক বিপর্যয় ও উত্থানের কাহিনি। প্রসঙ্গত বলা যায় দেশ বিভাগের ফলে বিপর্যস্ত একটি পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মাধুরী নামক মেয়েটির আত্মত্যাগের কাহিনি উপস্থাপন করে শংকর সম্ভবত দেশবাসীকে একথা জানাতে চেয়েছেন যে --- দেশবিভাগ বাঙালি জীবনে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করেছে। অন্যদিকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক' উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি দেশভাগের বলি এক কিশোরের (মাধব) কাহিনি। দেশভাগের ফলে বিশ্বেশ্বর দিদি ও ছেলে মাধবকে নিয়ে এদেশে আসে। কিন্তু দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও আঘাতে আঘাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিশ্বেশ্বর। এইসব মর্মবিদারী নিঃসঙ্গতার মধ্যেই দিন কাটে মাধবের। অর্থাভাবে মাধব নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেনা। স্নেহ ভালোবাসা পায়না, জীবনের সমস্ত সুখ ভোগ থেকে সে বঞ্চিত। কারণ তার একটাই দোষ সে উদ্বাস্তু। শংকর বসুর 'শৈশব' উপন্যাসেও উদ্বাস্তু যদু নায়ক হয়ে ওঠে। যদুর বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি টি.বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্ত্রী সন্তান যদুকে নিয়ে ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসে অতি কষ্টে সংসার চালায় এবং স্বপ্ন দেখে যদু বড় হয়ে পরিবারের এবং পিতার মুখ রক্ষা করবে। যদুর মা অন্নপূর্ণা চরম দুর্দিনেও যদুকে লেখাপড়া শেখাতে চায়। কিন্তু রিফিউজী কলোনির অন্য পাঁচটি ছেলের মতো যদু ছন্নছাড়া হয়ে যায়। পুত্রকে নিয়ে বেঁচে থাকার রঙিন স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় অন্নপূর্ণার।

প্রবোধকুমার সান্যালের 'হাসুবানু' উপন্যাসটির পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ---- "দেশ বিভাগের নিদারুণ অবিচারে হাজার হাজার মানুষের ভাগ্যচক্র ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তারই মর্মান্তিক কাহিনি এই উপন্যাসের মূল বিষয় বস্তু। বলা যেতে পারে এক বিষাদময় কালের বিষণ্ণতম ইতিহাস এই হাসুবানু" উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি বাস্তুচ্যুত উদ্বাস্তু জীবেন্দ্রনারায়ণ দারিদ্র্য ও মানসিক বিপর্যয় হেতু দেহত্যাগ করে। সেই সঙ্গে আর্থিক অনিশ্চয়তার ফলে মীরা বিমলাক্ষ ডাক্তারের সঙ্গে এবং সুমিত্রা বেল্লিক মশাই-এর সঙ্গে স্বেচ্ছায় নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সম্পর্কের গভীরে নিহিত ছিল উদ্বাস্তু জীবনে নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। ফলে দেশভাগের নিদারুণ বিপর্যয়ে ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে চলে আসা একটি অভিজাত পরিবার কিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তারই বিষাদময় ঘটনার একটি সরলীকৃত উপন্যাস 'হাসুবানু'। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাঙালি জীবনে সর্বাধিক মর্মন্তুদ বিষয় দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লিখেছেন 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' উপন্যাস। উপন্যাসে লেখক শিয়ালদহ স্টেশনে আগত দেড় শতাধিক উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি তুলে ধরে পাঠককে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় করে দেয়। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন --- যাদের ঘরবাড়ি নেই কিন্তু এককালে ছিল, বর্তমানে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে যাদের আশ্রয়স্থান তাদের খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান নেই, শিক্ষা-দীক্ষা নেই, তারা আজ মূল্যবোধহীন। এই রকমই একটি অনন্য চরিত্র মুক্তা। যে দেশভাগের আগেই বাবাকে হারিয়েছে। কাকা অনন্তলাল চক্রান্ত করে তার পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছে। পরক্ষণেই দেশ ভাগের নিদারুণ

পরিস্থিতিতে মুক্তা কলকাতায় এলে তার স্থান হয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখানে নানা সমস্যার মধ্যে বেঁচে থাকাটাই যখন অনিশ্চিত ঠিক তখনই মুক্তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে অসৎ বলাইয়ের, সে মুক্তাকে বেঁচে থাকার আশা দেখিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ঘটে গেছে কুমারেশের স্ত্রীর খুন, রতির আত্মহত্যা, গুণ্ডাবাহিনী রজনীর দলের ক্রিয়াকাণ্ড এইসব কিছু মিলে শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রিত বাস্তুচ্যুত বাঙালি জীবনের যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে সম্ভবত নেই।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসের মুখ্য বিষয় একটি উদ্বাস্তু পরিবারের বিপর্যয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। উদ্বাস্তু নারী নীতার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও 'সোনা ফসলের পালা' নামে দণ্ডকারণ্যের পটভূমিকায় উদ্বাস্তু জীবনীশ্রিত বাঙালি উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনি নিয়ে লিখেছেন আরেকটি উপন্যাস। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রামের পাশাপাশি উদ্বাস্তু জীবনে প্রেম ভালোবাসা, ঈর্ষা, লালসা, অবৈধ প্রেম, প্রেমে ব্যর্থতা প্রভৃতি ঘটনা যাত্রাপালার মতোই রুদ্ধশ্বাস গতিসম্পন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে উক্ত উপন্যাসে। লেখকের 'তবু বিহঙ্গ' উপন্যাসটিতে পশ্চিম রাঢ়ভূমিতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশিত। ড. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন ---- "উদ্বাস্তু কাহিনি শুধু ভাগ্যহত মানুষের ক্ষুব্ধ অভিযোগ ও নিষ্ফল ঘটনা বিড়ম্বিত জীবন প্রয়াসের পর্যায় ছাড়াইয়া সাহিত্যের অমৃত নিঃষ্যন্দী রসে অভিষিক্ত ও করুণ অর্থবহ জীবন সমীক্ষার আভিজাত্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।" [৯]

বনফুলের 'পঞ্চপর্ব' উপন্যাসটির প্রতিবেদন অভিনব। উদ্বাস্তু জীবনের দারিদ্র্য, গ্লানি, অনিশ্চয়তায়, দেশবিভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত জনতার সম্পত্তি বিনিময় এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে জটিলতা গোয়েন্দা কাহিনির মতো উপন্যাসটিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়কর, রহস্যময়, আশ্চর্যজনক নানা ঘটনা উপন্যাসে সংঘটিত হয়েছে। এইসব কিছুর মূলে আছে উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লাভালাভের অঙ্ক। উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ---- "এই পর্যন্ত বাঙলা দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সর্বরিক্ত প্রতিবেশচ্যুত, করুণ দিকটাই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বনফুলই একমাত্র ঔপন্যাসিক যিনি ইহার বৈষয়িক বিপর্যয়ের দিক, ইহার মধ্যে কূটবুদ্ধি প্রয়োগের অবসরটি লক্ষ্য করিয়াছে।" [১০]

হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' উপন্যাসের নায়িকা নামহীন সামান্য সাক্ষর মুসলমান নারী পশ্চিমবাংলার একটি গ্রামের গণ্ডির মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়েছে। তার নিতান্ত পরিবার কেন্দ্রিক জীবনের মধ্যেও ছায়াপাত করেছে সময় --- মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগের মধ্যদিয়ে। সে ভাবতে পারে না মানুষকে কদু-

কুমড়োর মতো কাটা যায়, কিন্তু কলকাতার দাঙ্গায় কাটা পড়ল রায় বাড়ির সত্য, আর গ্রামের দাঙ্গায় ইসুফমিয়া। এরই মধ্যে নয় বছর থেকে সে শুনছে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে ও তার স্বামী কেউ ব্যাপারটাকে বুঝতে পারেনা, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ। সবাই কি সব ভুললে ? এক মাঠ, এক ঘাট, এক রাস্তা, এক খরানি, এক বর্ষা, এক ধান।" এবং সে বুঝে ---- "দাঙ্গা তো জেবনের লিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের লিয়ম।" কিন্তু দেশ ভাগ হলো। "বড়ো লোক অবস্তাপন্ন মোসলমানদের লেগে ভালো ঢল নেমেছে পাকিস্তানের দিকে।" চাকরি পেয়ে বড় ছেলে, জামাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, এই বিষাদিনী নারীর মনে হয়, সমাজ সংসার সব ভাঙবে, "এ্যাকটো গোটা মানুষও আর গোটা থাকবে না।" এই নারীর স্বামীও বাড়ি বদল করে পূর্ব পাকিস্তানে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির কাছে চলে যেতে চায়। মাথায় বাজ পড়ে তার, 'পিথিমি ঘুরে উঠল আমার চারপাশে', সে দেশভাগ মানতে পারে না, 'আসমান তো দুরকম নয়'। অনেকে দেশভাগ ব্যাপারটা তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে পারে না। বরং সে বলে --- "যিখিনে শুদু মোসলমানরা থাকবে কিন্তু হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের ?" সবাই পূর্ব পাকিস্তানে গেলেও সে থেকে গেল একা এপারে। আর থেকে গেল দিঘির পাড়ে কবরে শুয়ে থাকা চিরকিশোর তার প্রথম সন্তান। এই বেদনাজর্জর অথচ দেশভাগ প্রত্যাখ্যান করা আত্মস্থ নারীর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক দেশভাগের যন্ত্রণাকে মর্মস্পর্শী ভাবে রূপায়িত করেছেন 'আগুন পাখি' উপন্যাসে।

দেশভাগের দাঙ্গার সুযোগে ভিন্ন ধর্মের পুরুষের মেয়েদের ঘটেছিল 'widespread sexual savagery'। বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করার চূড়ান্ত উপায় নারী ধর্ষণ। মেয়েদের যৌন-শুচিতা আর সম্প্রদায়ের সম্মান সমার্থক, এই পিতৃতান্ত্রিক সমীকরণে ঘটেছিল যেমন ধর্ষণ, তেমনি বহু আত্মহননের ঘটনা। পিতৃতান্ত্রিক মগজ ধোলাইয়ের ফলে বহু মেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, বরং মরে যাব, তবু ধর্মান্তরিত হবনা। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষিতা ঝিনুক দিনরাত শূন্য ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে, সবসময় আতঙ্কিত হয়ে থাকে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ধর্ষিতা মালতী বারে বারে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলার পি.এল. ক্যাম্প' উপন্যাসে কুমুদিদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল "আব্দুল গনির অঙ্কশায়িনী হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ করে নিলাম।" আবার জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের নায়িকা সুতারা যখন নিরাশ্রয়, তখন বাল্যবন্ধু সাকিনা প্রস্তাব দিয়েছিল, বৈবাহিক সম্পর্কের' সুতারা তাদের পরিবারের একজন হয়ে যাক। সুতারা উত্তরে বলেছিল "যে সম্প্রদায়ের মানুষ তার বাবা-মার মৃত্যু ও দিদির অপহরণের জন্য দায়ী, সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে সে আপন করে নেবে কেমন করে ?" দেশভাগ নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠকে এখানে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এছাড়াও দেশভাগ হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়কেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সামাজিক সংস্কার তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাসের বিলকিস আর টগর ভালো বন্ধু। কিন্তু জলের ঘড়া কাঁখে থাকা অবস্থায় টগরকে বিলকিস ছুঁয়ে দিলে, টগরকে ঘড়া মেজে জলে ডুব দিয়ে নতুন করে ঘড়ায় জল ভরতে হয়। অপ্রস্তুত করুণ চোখে বিলকিস দ্যাখে টগরের ঘড়ার ফেলে দেওয়া জল --- "ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন একটা মোটা দাগ কেটে" নদীর দিকে নেমে যায়। এই জলের রেখার মতো দেশভাগ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠিক এই ভাবেই এক সুস্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে আমরা দেখি তাহের তার ব্রাহ্মণ বন্ধুকে গোমাংস খাইয়ে দিয়েছে, আবার 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়িনী ফতিমা সোনাকে ছুঁয়ে দিলে সোনাকে বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হয়। এইভাবেই সংস্কারের বাড়বাড়ন্তের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুদের পাকিস্তান ছাড়ার দুটি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। সেখানে জনৈক হিন্দু চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয় --- "এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।" অন্যদিকে মুসলমান যুবক সমু বলে ---- "একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারি তগ। শিক্ষাদীক্ষা সব হিন্দুদের।" আবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ ও ঠিক একই কথা বলে ---- "মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।" একই কথা বলে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের মনসুর। তার তালিকায় যোগ হয় --- "হাকিম হিন্দু আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান, জেইলার হিন্দু কয়েদী মুসলমান।" অর্থাৎ একদিকে ক্ষমতা, অন্যদিকে ক্ষমতাহীনতা। এতদিন যে প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা ভোগ করে এসেছিল হিন্দু সম্প্রদায় তা হারানোর ভয়েই দেশত্যাগ করে এপারে চলে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশভাগের নিদারুণ ভয়াবহতায় পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, নৌকায়, স্টিমারে সামান্য সম্বল নিয়ে বা নিঃসম্বল অবস্থায় মানুষ স্বজন হারিয়ে বা না-হারিয়ে, শরীর মনে ক্ষত নিয়ে, রাতদুপুরে ঘোরের মধ্যেই ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নেমেছিল। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসে নায়ক পৃথ্বী প্রণয়িনী সীমার সন্ধানে এসে দেখে রবিশাল এক্সপ্রেস থেকে বিপর্যস্ত ছিন্নমূল মানুষ স্রোতের মতো নেমে আসছে। আবার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশের মোমিও থেকে 'উজান স্রোতে'-র লেখিকা নীলিমা দত্ত ও তাঁর পরিবারের সবাই ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায়, গরুর গাড়িতে, পায়ে হেঁটে, ছয়লক্ষ মানুষের অন্তর্গত হয়ে ভারতে চলে এসেছিল। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে নীলিমা ভেবেছিলেন "আর ভয় নেই, এদেশ আমার।" কিন্তু পরক্ষণেই দেশভাগের

নিদারুণ যন্ত্রণায় চট্টগ্রাম থেকে তাদের চলে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে। কেননা দেশভাগের ভয়ভহতার মধ্যেই এক বিশ্বস্ত মুসলমান প্রজা এসে বলে --- "মা-ঠাইন, আইজ রাইতেই আপনাগো ঘরে আগুন দিব। আপনারা পালাইয়া যান।" এই মর্মান্তিক পলায়নের ফলেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে হারীত মণ্ডল বলে ---- "সত্যাই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশনে রিফিউজি থিক থিক করত্যাছে।" এই মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার মধ্যেও সাতপুরুষের বাস্তুচ্যুত হতে চায়না শঙ্খ ঘোষের 'সুপারিগাছের সারি' উপন্যাসের নীলুর দাদু, তিনি পরম বেদনায় বলেন ---- "কাছারি বাড়ির পিছনে সুপারি বনের সারি, এক একটা করে ওর সবকটা আমার হাতে লাগানো - --- ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বলতো আমি যাই কোথায় .....।" তবুও যেতে হয়, নীলুর দাদুকে। ইতিহাসের ঘূর্ণিঝড় তাকেও উৎখাত করে নিয়ে আসে এপারে। 'উদ্বাস্তু' নামে পরিচিত হয়ে নাম লেখাতে হয়েছে শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু মনে থেকে গেছে একরাশ যন্ত্রণা আর ফেলে আসা স্মৃতি।

পক্ষান্তরে বলার কথা যে, দেশভাগের যন্ত্রণা মানুষ শুধু সহ্য করেছে তা নয়, সেই যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য সংগ্রামেও লিপ্ত হয়েছে অনেকে। সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ' উপন্যাসে আমরা দেখি জমির মালিক ভূপাল সাহার গুণ্ডাবাহিনী কলোনি ভাঙতে এলে তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। পরাণের মা গুণ্ডাদের বাধা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। 'স্বরলিপি' উপন্যাসে জমির মালিকের গুণ্ডারা আক্রমণ করতে এলে কলোনির মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। উদ্বাস্তুদের সামনে মধু মুখার্জি বক্তৃতা দেয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি জানায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে বাগানবাড়ির মালিক ও কারখানার মালিকের যৌথ প্রচেষ্টায় কলোনির উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে, কলোনি ভাঙার উদ্যোগকে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারায় অর্জুন। এই ভাবেই একের পর এক ঘটনার বিন্যাস, দেশভাগের বাংলা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচ্য উপন্যাসগুলি ছাড়াও সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'মহাকাল', মনিকুন্তলা সেনের 'মেঘে ঢাকা তারা', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'জাল', সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘর-বাড়ি', জরাসন্ধের 'মানসকন্যা' প্রভৃতি উপন্যাসেও দেশভাগ, উদ্বাস্তু ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকরা সমকাল ও জীবনের বাস্তবতাকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তাতে কোন দ্বিমত নেই।

পরিশেষে হাসান আজিজুল হকের একটি মন্তব্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন বিষয়ের আলোচনা শেষ করবো। হকের মন্তব্য ---- "..... দেশ বিভাগকে বিষয় করে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারত,

তা আর হলো না। ক্ষমতার অভাবটাই বড় কথা নয় - দেশ বিভাগের ফলে যাঁরা উৎসাহিত হয়েছিলেন সেই মধ্য শ্রেণির দিক থেকেই ঘটনাটি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার জন্য যাদের পক্ষে সত্যিকারভাবে উৎসাহিত হওয়া সম্ভব হয়নি --- আমি গ্রামবাসী বিপুল সংখ্যক কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষের কথাই বলছি --- তাদের দিক থেকে ঘটনাটি কখনোই সাহিত্যে এল না। অথচ এটা তো ঠিক যে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তের যে ছিটে ফোঁটা লাভ হয়েছিল তার তুলনায় সাধারণ মানুষকে অসহ্য ভোগান্তি ও নির্যাতনই সহ্য করতে হয়েছে। দেশ বিভাগের পরে যে চূড়ান্ত ও হৃদয় বিদারক মানব বিপর্যয় ঘটেছে তা নিয়ে কোনো ঔপন্যাসিকই লিখলেন না।"[১১] আজিজুল হকের এই মন্তব্য দেশভাগের বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে একশো ভাগ সত্য ও গ্রহণযোগ্য।

(৬) বাংলা নাটকে উদ্বাস্তু জীবন ঃ—

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ প্রভৃতি ঘটনা বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। বাঙালির শান্ত, মৃত্তিকালগ্ন জীবন আঘাতে-আঘাতে ছিন্নমূল তৃণের মতই অসহায় ভাবে এক মহাশূন্যতার মধ্যে দিগভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কারণ আকাশে-বাতাসে মৃত্যুর হুঙ্কার, শান্ত বাসভূমিতে বিদেশী সৈন্যদের উদ্ধত আস্ফালন, চারদিকে আলকাতরায় লেপা রাতের বীভৎস বিভীষিকা। এই সবের মধ্যে মানুষের ধর্মও নীতি বিলীন হয়ে গেছে। কালোবাজারীর উদ্ধত ভোগলিপ্সার কাছে মাথা নত করে একহাতা খিচুড়ির জন্য সারাক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে মারামারিতে রক্তাক্ত দেহে শরণার্থী শিবিরে মানুষ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রকাশ্য দিবালোকে সেদিন প্রত্যক্ষ করা গেলেও একখানা বস্ত্র দ্রৌপদীকে এগিয়ে দিতে কেউ আসেনি। নিজের মান-প্রাণ বাঁচাতে মানুষ একহাতা ফেনের জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পেতেছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দালাল, ঠিকাদার ও অসাধু ব্যবসায়ীরা পরমানন্দে শাসকগোষ্ঠীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে বাঙালির অবশিষ্ট রক্তবিন্দুটুকু শোষণ করে নিয়েছে। ফলে কেউ নিজভূমিতি নিঃসঙ্গ, কেউ বা বাস্তুভিটা হারিয়ে নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু হয়ে দিগভ্রান্ত পথিকে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলার কথা, দেশভাগের ফলে আমাদের সমাজে যে অভাবিত দুর্যোগ নেমে এসেছিল তা আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত ও শান্তিমগ্ন জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ, খোলা রাস্তায়, স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ও বদ্ধ তাঁবুর মধ্যে অগণিত শরণার্থীর বসবাস, সমাজের দৃঢ় ভিত্তিভূমিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। পারিবারিক জীবনের শালীনতা ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। বিকৃত লালসা ও অশুভ অর্থলিপ্সার ফাঁদ পেতে বসেছে কালোবাজারী আড়তদাররা। অভাবের

তাড়নায়, ক্ষুধায় উদর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সেইসঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আমূল পরিবর্তন (বিপর্যয়) ঘটেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর ও বাস্তুত্যাগের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের মূল ছিন্ন হয়ে গেছে। জীবন রক্ষার্থে বংশ, জাতি ও বর্ণমর্যাদা ভুলে মানুষ নানা কর্মে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলো। সামাজিক নীতি সম্বন্ধে একটা ভ্রূক্ষেপহীন, বেপরোয়াভাব মানুষের সমাজ গঠনের মনোভাবে ব্যাপকভাবে আঘাত হানার ফলে গৃহপালিত লজ্জাকোমল, আত্মবিলোপী আদর্শগুলি শুকনো পাতার মতো উড়ে গেল। সমাজ ব্যবস্থা হয়ে গেল অভিভাবকহীন। মোটকথা যুদ্ধ, দেশভাগের ফলে সমাজ ইতিহাসের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, ফলস্বরূপ বাংলা নাটকে শান্ত ও আনন্দময় পল্লীজীবনের রূপ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং সংঘাত ক্ষুব্ধ নাগরিক জীবনপথে অথবা শ্রীহীন শহরতলীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট বস্তিজীবনই প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা নাটকে। নাট্যকাররা বাস্তববাদী জীবন পর্যবেক্ষক রূপে পরিবেশনের রুক্ষতায়, দ্বন্দ্বমুখর মানুষের দৈনন্দিন কলহ কোলাহলে, লোভ ও লালসার কুৎসিত পদক্ষেপে জীবন যেখানে অশান্ত ও বিপর্যস্ত সেদিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন।

দেশবিভাগের ফলে জাতীয় জীবনে যে দুঃখ ও সঙ্কট নেমে এসেছিল, সেই সঙ্কটের ফলে যারা বাস্তুভিটা হারিয়ে 'উদ্বাস্তু' হয়েছে তাদের জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটেছে সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর', তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এই স্বাধীনতা', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন', জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছেনা' প্রভৃতি নাটক।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' (১৯৬০) নাটকে একজন উদ্বাস্তু স্কুল শিক্ষক সপরিবারে কিভাবে ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে বস্তিবাসী শ্রমিকজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে বাধ্য হয়েছেন তার কাহিনি। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন ---- "নীতিবাদের প্রশ্ন নয় -- জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে সে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল --- নাটকে তার অপলাপ করা কোনো নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারেনা।" নাটকে কিভাবে গোত্রান্তর ঘটল তা বলতে গেলে বলতে হয় --- মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসলো এবং বিয়ে করলো -- এটাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য আছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা ও শ্রেণি আভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করে কায়িক পরিশ্রমজীবি শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই প্রকৃত গোত্রান্তর। নাটকের সূচনা অথবা exposition-এ হরেন্দ্রের যে শিক্ষকজীবন আমরা দেখেছি তার সামান্য বিক্ষুব্ধ কোন বিকাশ ও পরিণতি নাটকের মধ্যে দেখা যায়না। শিক্ষকজীবনের কোন স্বপ্ন ও আদর্শ

পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাঁর সংঘাত এবং তার ফলে কোন দুঃখজনক পরিণতি অথবা কোন নবালোকিত পথে পরিত্রাণের ইঙ্গিত নাটকে দেখানো হয়নি। নাটকের শেষে গৌরী ও কানাইয়ের অসমগোত্রীয় মিলনই প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ গৌরী ও কানাইয়ের পারস্পরিক প্রেমের আভাস তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের আগে আমরা পাই না। সুতরাং নাট্যকার যে সমস্যাটির সমাধানে নাটকের সমাপ্তি টেনেছেন তা নাটকের মধ্যে নিতান্তই আংশিক ও আকস্মিক। নাটকের অন্যান্য চরিত্র --- বাড়িওয়ালা, ছোটবাবু, সরকার, দারোয়ান প্রভৃতি চিরপরিচিতি বৈচিত্র্যহীন অমানুষ শ্রেণির লোক। কারণ দেশভাগের কঠোর নিয়তি এইসব মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে।

তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৮৫৭) দেশভাগের ফলে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা মানুষের জীবনকে যে কী শোচনীয় স্তরে নামিয়ে আনতে পারে তারই এক মর্মান্তিক চিত্র নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সংসারের কর্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া নানা বেদনা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সংসারটি স্নেহ মমতার সযত্ন আচ্ছাদনে ঢেকে রেখেছিল। প্রথম দৃশ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারের লক্ষ্মী চলে গেল, পড়ে রইল শুধু সংসারটি, অলক্ষ্মীর দৌরাত্ম সেখানে আশ্রয় নিল। সংসারের কর্তা ইন্দ্রনাথ মদের পাঁকে ডুবে থাকে, সংসারের প্রতি, ছেলেদের প্রতি এবং নিজের প্রতি তার নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। বড়ছেলে বিশু ও ছোটছেলে ছোটকা মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবাকে দায়ী করে। পিতা ও পুত্রদের সম্পর্ক শুধু পারস্পরিক ঘৃণা ও অভিযোগের। বিশু ও ছোটকা ঘর থেকে বের হয়ে গুণ্ডাদলে যোগ দেয়। গুলিতে ছোটকার প্রাণ গেল আর বিশু খুন করে ঘরে এলে শেষে ধরা পড়ল। হতভাগ্য ইন্দ্রনাথও অবশেষে আত্মহত্যা করে অভিশপ্ত জীবনের সব জ্বালা মেটালো। পরপর এই মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি দেশভাগে পূর্ববর্তী সুস্থ মনের উপর যেন একটা নৃশংস আঘাত নেমে এসেছে। ফলে বলা যায় সংসারের স্বাভাবিক স্নেহ সম্পর্কের সব মাধুর্য ও আদর্শ ধূলিলুন্ঠিত দেখে মনুষ্যত্ববোধ যেন মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করে তারই নাট্যরূপ 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'।

দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) নাটকে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুদের কি বিষম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা একটি গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতের পরিবারকে কেন্দ্র করে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতেই যখন দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে তখন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে নিশ্চিন্ত সুখ শান্তির আশা নিয়ে বাস করা সত্যি কঠিন। নাটকে কফিলদ্দি ও আমীন মুন্সী মিলনের পথ দেখিয়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার সময় তাদের প্রভাব যে নগণ্য তা ভুক্তভোগীরা অবশ্যই স্বীকার করবে। আসলে বাস্তুভিটা ত্যাগ করা মর্মচ্ছেদের মতই ক্লেশকর। কিন্তু যেসব লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে এসেছে ও আসছে তারা শুধু হুজুগ কিংবা মিথ্যা আতঙ্কে গৃহহীন হয়েছে তা নয়, নিরুদ্বেগ শান্তির আকাঙ্খায় সমাজ গঠনের আশা ধূলিসাৎ হয়েছে বলেই মানুষগুলি 'বাস্তুভিটা' ত্যাগ করে

উদ্বাস্তু জীবনের হতাশা-গ্লানিকে চিরদিনের জন্য বহন করে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এই স্বাধীনতা' (১৯৪৮) নাটক সম্পর্কে বলা যায় --- স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেকে যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে স্বাধীনতার ফলে আমরা পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদেরকে তাদের দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে এসে যে স্বাধীনতার গৌরব ও অধিকারে ছিন্নমূল শরণার্থী নর-নারীর কোন অংশই রইল না তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় কি না ? একই প্রশ্ন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের মনকেও বিচলিত করে তুলেছিল। তাই 'এই স্বাধীনতা' নাটকে দীপক-প্রমথ-কার্তিক-অবনী-প্রভাবতী-রাইমনিদের জীবনে সুখ-সম্পদ, আশা-স্বপ্ন সবই ছিল, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে আজ তারা আশ্রয়হীন, অন্নহীন ভিক্ষুক। নাট্যকারের মুখপাত্রী নিশ্চয়ই সাধনা। সাধনার মাধ্যমে নাট্যকার তার আশাবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার উল্লেখ করেছেন --- "জাতির সাধনা অবিরাম শোনায় --- স্বাধীনতা সত্য, স্বরাষ্ট্র মিথ্যা নয়। অভাব মানব অভ্যুদয়। সে আঘাত পায়, আহত হয়, কিন্তু হত হয়না। জাতির সাধনার শেষ নেই, কখনো তা শেষ হয়না, মানব অভ্যুদয়ই চরম লক্ষ্য।" নাটকে নায়িকা সাধনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার এসব কথা বলতে চেয়েছেন। সেই জন্যই চরিত্রটিতে ঘাত প্রতিঘাতময় ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা নির্জীব তত্ত্বসর্বস্বতাই প্রাধান্য পেয়েছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের গ্লানি নিয়ে যখন উদ্বাস্তু ভিক্ষুক কার্তিকের লাঠির আঘাতে সাধনার মৃত্যু হল তখনই স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবন যন্ত্রণার ছবি পাঠকের কাছে সময়ের সত্যতায় প্রকাশ পেল।

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'(১৯৫৩) নাটকে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দুটি বাঙালি হিন্দু পরিবার কিভাবে কলকাতার নাগরিক জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে, আঘাত অপমান ও অমানবিকতায় নিষ্পেষিত হয়ে পশুতুল্য জীবনের মতো বেঁচে থাকার লড়াই করেছে, কিভাবে তাদের নৈতিক চরিত্র ও সামাজির অধঃপতন অনিবার্য হয়ে পড়েছে তারই জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলার কথা, রাজনীতির উপরতলায় দেনাপাওনার দর কষাকষি চলে, কালির আঁচড়ে চুক্তির সাক্ষ্য থাকে। কিন্তু সেই কালির আঁচড় যে নীচুতলার মানুষের হৃদয়ে রক্তের রেখা হয়ে উঠে তা প্রতিমুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষত জীবনে অনুভব করে। স্বাধীনতা দেশের মাটিকে দুইভাগ করে আমাদের মিলিত জীবনের আশা আকাঙ্খাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এক অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ঠেলে দিয়েছে। ছিন্নমূল নর-নারী বাস্তুভূমির মায়া ত্যাগ করে স্বাধীন দেশের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে চেয়েও বিফল হয়েছে। ফলস্বরূপ তাদের সংসার ছিন্ন হয়েছে। মনুষ্যত্বও লুপ্ত হয়েছে, জীবনের সব আশা ভরসা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, শুধু 'উদ্বাস্তু' হিসেবে পরিচিতিটাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এই 'উদ্বাস্তু' জীবনের যে কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখানো হয়েছে এইভাবে --- পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংস্কৃত পণ্ডিত মনোমোহন ভট্টাচার্যের চাকরি গেল, বাস্তুভিটা সামান্য টাকায় বিক্রি করে স্ত্রী, কন্যা ও দুই ছেলেকে সঙ্গে

নিয়ে কলকাতায় চলে এল। অল্পদিনের মধ্যেই সঞ্চিত ধন নিঃশেষ হল। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেলেও কাজের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ছুটে বরং অপমানিত হতে হল পণ্ডিতমশাইকে। পণ্ডিতমশাই অসুস্থ হলেন। মেজ ছেলে দুইখ্যা চুরির কাজে লিপ্ত, গাড়ির চাকায় পা কেটে হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছে। ছোট ছেলে মোহন পড়ালেখা বাদ দিয়ে কুলিগিরি করে সংসার চালাতে সচেষ্ট হলেও ব্যর্থ হয়েছে। কন্যা পরী মা-বাবা, দাদাদের মাথার বোঝা হয়ে আছে বুঝতে পেরে নিরুদ্দেশ হয়। পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী শেষ সম্বল একজোড়া সোনার বালা তাও বিক্রি করে দেন লোহার দামে। এই প্রেক্ষাপটে একদিকে শাণিত ও মার্জিত নাগরিক সমাজের কুশ্রী ও কদর্য রূপ যেমন উদঘাটিত হয়েছে তেমনি দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে কিভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজ ঘটেছে তারও বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতের পরিবার ধ্বংস হল --- দুইখ্যা মরল, পরী গৃহত্যাগী হল, পণ্ডিতমশাই মরল, পণ্ডিতের স্ত্রী বেঁচেও অর্ধমৃতা হয়ে রইল। কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে একটি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ হাহাকারের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে --- সেই প্রতিবাদ নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' (১৯৪৯) নাটকে দেশভাগের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্তন ও গুরুতর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তারই বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানুষের জীবনে হঠাৎ যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফাটল ধরেছে সেই বিষয়ে কোনও থিওরি নয়, কোন পক্ষপাতী বা অতিরঞ্জন নয়, সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধ দৃষ্টি দিয়ে নাট্যকার সমস্যাটির অন্দরমহলে পা ফেলেছেন। ফলস্বরূপ নাট্যকারের বাস্তবদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে প্রতিপত্তিশালী জমিদার হঠাৎ কিভাবে তার সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসন থেকে মাটিতে নেমে এসেছে, কিভাবে পাকিস্তানে এক শ্রেণির মুসলমান লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠার ফলে বাঙালি হিন্দুরা কি নিদারুণ মর্মপীড়া ভোগ করে শুধু বেঁচে থাকার শপথ নিয়ে সর্বস্ব ছেড়ে এপারে এসেছে। নাট্যকার আরো তুলে ধরেছেন শ্রেণি বিপর্যয়ের মুখে নির্যাতিত তপসিলী সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কি রকম স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দিল এবং কিভাবে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী আত্মসর্বস্ব মানুষ সেই ডামাডোল ও লুটপাটের সুয়োগে নিজেদের নীচ স্বার্থসিদ্ধি করেছে। পক্ষান্তরে সুখে সম্প্রীতিতে ভরা, পালা-পার্বণ-গান ও জীবনের আনন্দে উজ্জ্বল ছাতিমপুর গ্রাম অবশেষে সর্বনাশা আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে। এ আগুন শুধু যে ছাতিমপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, এ আগুনের লেলিহান শিখায় গোটা বাংলাদেশ পুড়েছে। ফলত দিনারম্ভের প্রসন্ন আশ্বাস এবং দিনান্তের ব্যর্থ জ্বালা দুইটি রূপই 'দিনান্তের আগুন' নাটকে দর্শক-পাঠক একত্রে লক্ষ্য করেছে।

'মুছেও যা মোছেনা' (১৯৬৫) নাটকে নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি রূঢ় সমাজসত্য

নির্মম বাস্তব দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। দেশবিভাগের ফলে সাধারণ মানুষ যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কবলে পড়েছে তারই চিত্র 'মুছেও যা মোছেনা' নাটকের মূল বিষয়। যে নিরাপরাধা মেয়েটি নৃশংস দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অধিকারিণী হল তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তাকে নরকের পথে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে অমানুষিক নীচতা ও কাপুরুষতা প্রকাশ পেয়েছে নাটকে তারই ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে। কুন্দ তার লাঞ্ছিত নারীজীবনের সব লজ্জা ও কলঙ্ক একটি বোমার আকারে সমাজের কোটে ঠেলে দিয়েছে। বোমাটি তার ধর্ম অনুযায়ী সমাজের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। পাকিস্তান থেকে হতভাগ্য ছিন্নমূল সর্বহারারা এদেশের মাটিতে পা রেখেছিল এক বুক শান্তি ও নিরাপত্তার আশায়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে পা রেখেই ঘূর্ণিঝড়ে ডালপালা ভাঙ্গা গাছের মতই শূন্য রিক্ততা নিয়ে রামদুলাল আর্তনাদ করছে, মহিম মাস্টার তার হারানো স্ত্রী ও কন্যাকে নিষ্ফল ভাবে খুঁজছে, বাদল কুণ্ডু কন্যাদের দেহপণ্যে বেঁচে আছে। নরহরি ঘৃণ্য লালসার ব্যবসায়ের দালালী করছে এবং ছেলে একটি সমাজবিরোধী গুণ্ডায় পরিণত হয়েছে। সব মিলিয়ে এক শ্বাসরোধকারী বীভৎস পরিবেশ। যদিও সচেতন নাট্যকার রূপে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের পথের ও সন্ধান দিয়েছেন। তাই আমরা লক্ষ্য করি মানিকের সংগ্রাম পরিশেষে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে এবং কলঙ্কিত নারীত্বের বেদনা মুছে দেওয়ার জন্য ললিত কুন্দের দিকে তার আশ্বাসভরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' (১৯৫২) দেশভাগের পরিণতিতে বাস্তুহারাদের সমস্যা নিয়ে রচিত। নাটকে বাস্তুহারাদের শুধু দুঃখ বেদনা নয়, প্রবল সঙ্ঘশক্তি ও তীব্র প্রতিরোধের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। নাট্যকারের বক্তব্য ---- "ভাঙ্গা বাংলার প্রতিরোধই আমার শেষ বক্তব্য।" নাটকের শেষে একটি কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে --- "বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই।" পশ্চিম বাংলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সম্মিলিত বিদ্রোহের মধ্যে একটা যোগস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলার কথা যে নাট্যকার উক্ত নাটকে অঙ্কের স্থানে 'প্রবাহ' এবং দৃশ্যের স্থানে 'অংশ' কথাগুলি ব্যবহার করে প্রথম প্রবাহে দেশভাগ ও বাস্তুত্যাগ, দ্বিতীয় প্রবাহে শিয়ালদহ স্টেশনে জান্তব জীবনযাত্রা এবং তৃতীয় প্রবাহে আবার নতুন করে ঘরের সন্ধান ও রূপান্তরিত জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের জীবন সংগ্রামের কথা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার বাইরের গণ-উত্তেজনা ও সম্মিলিত সংগ্রামের তরঙ্গোচ্ছাস কিভাবে পরিবারটির জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে তারও রূপাঙ্কন করেছেন নাটকে। এছাড়াও মন্মথ রায়ের 'ভাঙাগড়া' (১৯৫০), তুলসী নাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩), দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' (১৯৫০), 'জীবনস্রোত' (১৯৬০), ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' প্রভৃতি নাটকে দেশভাগ প্রসঙ্গে 'উদ্বাস্তু' জীবনের নানাদিক নানা আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলার কথা যে, নাটক প্রধানত মঞ্চস্থ হওয়ার জন্যই লেখা হয়। লেখার পর দর্শকের সামনে অভিনীত হয়। সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারিরীক ভঙ্গি, বাচন ও ঘটনা সম্পর্কিত আচার আচরণে দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ সচেতনতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে নাট্যকারদের নাটক রচনার সময়ে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন যেমন, নাটকটি অভিনীত হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে সেই ঘটনার উত্তেজনা কিংবা আবেগিক ভাবের সৃষ্টি না হয়। হয়তো সেই জন্যই দেশভাগের বাস্তব জীবন, দর্শন, রাজনীতিকে বেশিরভাগ নাট্যকাররা এড়িয়ে গেছেন। কিংবা অনেক নাট্যকার আকারে ইঙ্গিতে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। ফলে বাংলা কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাসে দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের কথা যতটা বাস্তব সম্মতভাবে ফুটে উঠেছে নাটকে সেভাবে ফুটে উঠেনি।

(চ) নিঃসঙ্গতা ও বাংলা সাহিত্য ঃ—

নবজাগরণের পর থেকেই মানুষ তার ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে মতুন করে সচেতন হতে পেরেছিল এবং এই সচেতনতা ভাবীকালে নিঃসঙ্গতাকে বহন করে নিয়ে এসেছিল। শিল্প বিপ্লবের প্রভূত উন্নতি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছিল 'নিজের প্রাতিস্বিক সত্তা' থেকে। বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রবলতম এক মানসিক পরিবর্তন এনেছিল। তিরিশের দশকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ শিল্পীদের মননে এল কার্লমার্ক্সের অর্থনৈতিক চিন্তায় তার স্বাক্ষর পাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যেদিন পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিনই জন্ম নিয়েছিল নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে সংশয়ের আকশটা মানুষকে অস্থির করে তুলে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিল, অনিকেত অবস্থানে মানুষকে স্থির হতে বাধ্য করেছিল, সাহিত্যে তার রূপায়ণতা হয়ে যায়। পূর্বপুরুষ সূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক মূল্যবোধ সংশয়ান্বিত হয়ে ভেঙে যায়, অনস্তিত্বের একাকীত্ব মানুষকে তার বিরাট আড়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় "বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী" (প্রতীক্ষা/দশমী)।

আসলে পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ জীবন জাহাজের মাস্তুলকে অকূল সমুদ্রে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেল। দেশহীন পরিচিত ভৌগোলিক বৃত্তের বাইরে এসে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। পারিবারিক কাঠামো ভেঙে যাওয়া বিচ্ছিন্ন মানুষ, ভৌগোলিক সীমানা হারানো শিকড়হীন মানুষ, সনাতন মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা নিঃস্ব মানুষ এসে দাঁড়াল এক প্রবল শূন্যতার কাছে। নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারানো মানুষ উন্মাদপ্রায়। স্ব-অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন মানুষ নিঃসঙ্গ। Forman-এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায় --- "In the Last century the word 'alienation' was used by Hegal and Mery. Referring not to a state in insanity, but to a less drastic form of self estrangement which permits the peroson

to act reasonably in practical mater, yet which constitute one of the most severe socially patterened defects, the insane person in the absolutely alienated person, he has completely lost himself as the centre of his own experience, he has lost the sense of self"।[১২] আর মানুষ হয়ে গেল উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু হওয়ার ব্যাপারটি যেমন সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনা তেমনি তা হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট অনন্বয়বাদী দর্শন বা 'alienation'-এর প্রতীক।

সাহিত্যে যেহেতু মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি ঘটে। তাই মানব জীবনের এই আধুনিকতম শাখাটি গ্রহণে বাংলা সাহিত্যও পিছিয়ে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় বিদেশি রচনার মত সরাসরি বিচ্ছিন্নতা না এলেও নানা জায়গায় এর পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটির মধ্যে দাম্পত্য পঙ্গুতার সেই রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগ্নতার জায়মান বীজটিকে যেন আমরা পেয়ে যাই। আর বিচ্ছিন্নতা জনিত শূন্যতার উপস্থিতি সবচাইতে প্রকট জীবনানন্দের রচনায়। যে শূন্যতার প্রাবল্যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কবি লেখেন --- "আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে/আমাদের ক্লান্ত করে/ ক্লান্ত-ক্লান্ত করে।"[১৩] কিংবা অন্যত্র কবি উচ্চারণ করেন --- "সব কাজ তুচ্ছ হয় --- পণ্ড মনে হয়/সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময়/শূন্য মনে হয়/শূন্য মনে হয়।"[১৪]

বুদ্ধদেব বসু-র 'পাতা ঝরে যায়' একাঙ্ক নাটকে আমরা এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার স্বাক্ষর দেখি। নগরায়ণ আধুনিক মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে তারই ছায়া পড়েছে। গোপাল হালদারের ত্রিদিবা-য় অমিত চরিত্রে এই বিচ্ছিন্নতা নিঃসঙ্গতার পরিচয় আছে। জগদীশ গুপ্তের 'অরূপের রাস' গল্পে রাণুর নিঃসঙ্গতা, 'অঞ্জন শলাকা' গল্পে অমিতার শূন্যতা, অসাধু সিদ্ধার্থ-র নায়ক মনসংঘাতের আর্তি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তার বেদনাহত ট্র্যাজেডি আমাদের বিষণ্ণ করে, গল্পের নায়ক হয়ে উঠে "নিঃসঙ্গ নিসম্পর্কিত প্রাতিস্বিক মানুষ।"

এছাড়া বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে ইন্দির ঠাক্‌রুণের মুখে যখন উচ্চারিত হয় ---- "জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। বুড়ী সেই রূপ মুঠা আঁকড়াইয়া আশ্রয় খুঁজতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল -- আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।"[১৫] এই অনুভব শূন্যতার অনুভব, আশ্রয়হীনতার শূন্যতা, যার থেকে জন্ম নেয় বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। মানব মনন হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ। আর 'বিড়ম্বনা' গল্পে বিষ্ণুর জীবনের ব্যর্থতা, অপ্রাপ্তি যে নিঃসঙ্গতা বয়ে এনেছিল তাকে সীমাহীন প্রান্তরের ক্লান্তি ও অসীমতায় আমরা বিস্তৃত করে দেখি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র 'জ্বলা' গল্পে পরিতোষের

নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছিল একটি মাত্র অনুভবে, তা হল 'বিশ্ব সংসারে আমি একা'। এছাড়া বাংলাদেশের উপন্যাসিক আবুল ফজলের 'জীবন পথে যাত্রী' উপন্যাসে নায়িকা হেনা চরিত্রের মধ্যে আমরা এই নিঃসঙ্গতাবোধ ও একাকীত্বের জ্বালা ফুটে উঠতে দেখি। আবার শামসুল হকের 'দেয়ালের দেশ' আবু রুশদের 'ডোবা হল দীঘি' হুমায়ুন আহম্মেদের 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাসে আধুনিকতার এই মাত্রাটি সংযোজিত হয়েছে। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ যখন বলে উঠে, "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" -- তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে নিঃসঙ্গ জীবনের হাহাকারই বেদনামথিত হয়ে উঠে। আসলে চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জমান সাজানো বাগানের স্বপ্নভঙ্গ স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একাকীত্বে মানব জীবনে জন্ম নেয় নিঃসঙ্গতা, যার পরিণতিবোধকে হয়তো উদ্বাস্তুও বলা যেতে পারে। তবে একথা সত্য উদ্বাস্তু তথা নিঃসঙ্গতা একে অন্যের পরিপূরক, ভিন্নার্থে যা আধুনিক মানব মননের অপ্রতিরোধ্য নিয়তি।

সূত্র নির্দেশ

১। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৪১।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৪৯৮-৯৯।

৩। তদেব, পৃঃ ৪৯৯।

৪। যোগিলাল হালদাল (সম্পা), রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ১৮৯।

৫। মহাশ্বেতা দেবী, আঁধার মানিক, বিনীত নিবেদন, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ-৬।

৬। ড. শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা) দেশভাগের কবিতা, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৭।

৭। হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা, ১৯৯২।

৮। সেমন্তী ঘোষ (সম্পা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, কলকাতা, ২০০৯।

৯। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৯১।

১০। তদেব।

১১। হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা, ১৯৯২।

১২। Erich Eroman : The Sane Society, 1968, P-113.

১৩। জীবনানন্দ দাশ ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৮০।

১৪। তদেব, পৃঃ ১৮।

১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পথের পাঁচালী, ১৪১১, পৃঃ ১৯।

তৃতীয় অধ্যায়

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন

বাংলা সাহিত্যের সাম্রাজ্য আজ সুদূর বিস্তৃত। এই সমৃদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ উপন্যাস, ছোটগল্প নানা প্রতিভাধর স্রষ্টার মাধ্যমে নিরন্তর বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং করছে। বিচিত্র সুন্দর এইসব উপন্যাস ও ছোটগল্প পাঠের আকাঙ্খা ও পাঠকদের মধ্যে হয়ে উঠেছে প্রবল। তাই সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল পটভূমিতে উপন্যাসের ও ছোটগল্পের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে তার মূল্যায়নও হয়ে উঠেছে প্রত্যাশিত। শুধু তাই নয়, আঙ্গিকের যে বিবর্তন ঘটেছে তার সম্যক ধারণা লাভ করার আকর্ষণও কম নয়, সেই আকাঙ্খা ও আকর্ষণের কথা স্মরণে রেখেই অমিয়ভূষণের উপন্যাসে উদ্বাস্তুর জীবনভাষ্য খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

উপন্যাস, ছোটগল্প ইতিহাসের বিচারে আধুনিককালের সাহিত্য সাধনার শক্তিশালী শাখাই শুধু নয়, তা আধুনিককালের স্বহস্তে রচিত সেই গদ্যময় প্রতিমা যা জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারে সামর্থ। সেই জন্য হয়তো জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উপন্যাস ও ছোটগল্প। কেননা কথাকার তার নির্ভীক, নিরাসক্ত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবন ব্যাখ্যা করেন। তিনি জীবন পিপাসার তৃপ্ত সাধনের জন্যই জন্ম দেন উপন্যাস ও ছোটগল্পের, যার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই আরনল্ড কেটল কথিত জীবন ও জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ। সেখানে শিল্পিত স্বরগ্রামে প্রকাশিত হয় কথাকারের জীবনবোধ, তাঁর স্বদেশ, সমাজ, সমকাল এবং স্বতন্ত্রতা।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ের বহু পথভ্রষ্ট লেখকদের প্রতিপত্তি ও যথেচ্ছাচারে বাংলা সাহিত্য তার সবচেয়ে অভিশপ্ত সময় অতিবাহিত করেছে, তবু তার বিপরীত একটি সুস্থিত জীবনধর্মী ও শিল্প সচেতন ধার কিছুটা নেপথ্যচারী হলেও সতত বহমান। তাদের শিকড় প্রোথিত মানব সমাজ ও ঐতিহ্যের বিস্তারে, সাহিত্য তাদের কাছে নিছক অর্থ উপার্জন আর সস্তা পাঠক বিনোদনের সহজ মাধ্যম নয়, অমিয়ভূষণ মজুমদার (ছদ্মনাম - অহিভূষণ বাগচী ও ইমমরালিস্ট) সেই বিরল গোত্রের প্রতিনিধি স্থানীয়। কেন না তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বব্যাপী একটি চেতনা যে তাগিদে চরাচর সৃষ্টি করেছে, সাহিত্যিকও সেই একই তাগিদে সৃষ্টি করে থাকেন। সাহিত্যিকের চেতনা সেই সর্বব্যাপী চেতনার অংশ। আত্মানুসন্ধানের জন্য সাহিত্যিক অনেক সময় সত্য সুন্দর ও কল্যাণের প্রচলিত প্রত্যয়কে লঙ্ঘন করেও অগ্রসর হতে থাকেন। তবে সাহিত্যকে আলোচ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করতে হলে সাহিত্যিককে সাহিত্যের বহিরঙ্গকলা (প্রয়োগ কৌশল, যথোপযুক্ত অলঙ্কারের সদ্ব্যবহার) অতি

অবশ্যই আয়ত্তে আনতে হবে।

আসলে অমিয়ভূষণের প্রতিটি লেখা জন্ম নেয় ভিশন থেকে। তিনি বলেন --- "আমার মনে যে ভিশনটা আছে, সেটাই আমার গল্প"। তাঁর ভিশনই নির্দিষ্ট করে দেয় তাঁর লেখার থিম্-ভাষা-ফর্ম। তিনি বলেন --- "আমার প্রত্যেকটি গল্পের ভাষা আলাদা। থিম্ অনুসারে ভাষা তৈরি হয়, যদিও তা বাংলা ভাষা।" অমিয়ভূষণের কাছে সাহিত্য চর্চা এক ধরণের আধ্যাত্মিক, মানসিক মুক্তি -- ব্রহ্মস্বাদ সহোদরম। তিনি বলেন --- "কলম হাতে আমি আমার চরিত্রগুলোর মধ্যে থাকি মস্তিষ্কে মধুস্রাব হয় এবং সে মধু অ্যালকোহলের চাইতেও তীব্র আনন্দে আমাকে ভরে তোলে। অমিয়ভূষণের যাবতীয় সৃষ্টির উৎস 'ট্রমা'। আমার entire theory হচ্ছে to escape from the trauma, এই 'ট্রমা' থেকে 'এসকেপ' করার জন্য তাঁর সাহিত্য চর্চা। এই ট্রমা বোধের কারণে তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথায়'য় 'কমরুন শুকনো নরম সবুজ ঘাসে শুয়ে একটু হেসে আসফাককে নিজের স্তনে টেনে নিয়েছিল।'

যে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতো অমিয়ভূষণের সাহিত্য-জীবন শৈশব কৈশোর নিয়ন্ত্রিত। কোচবিহারে মাতুলালয়ে ২২ মার্চ ১৯১৮ খ্রীঃ জন্ম অমিয়ভূষণের। মৃত্যু ৯ জুলাই, ২০০১ খ্রীঃ। পাবনা পাকুড়িয়াতে তাঁদের তিন পুরুষের জমিদারি ও নীলকুঠীর মালিকানা ছিল। ছিল পদ্মা পাড়ে ভিটে-বাড়ি। শৈশবে দিদিমা-ঠাকুরমার কাছে শোনা গল্প, পাকুড়িয়ার পদ্মা পাড়ের স্মৃতি আর উত্তরবঙ্গের জল, মাটি আকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক তার জীবনে দীর্ঘতর ছায়া ফেলেছে। কোচবিহারে তখন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন আধুনিক শিক্ষানুরাগী স্বাধীন রাজার রাজত্ব। এই রাজা-রাণী-রাজবাড়ির ঘনিষ্ঠ অবলোকনের অভিজ্ঞতা তাঁর 'রাজনগর', 'নয়নতারা' এমনকি 'মহিষকুড়ার উপকথা' রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছে। যেমন শৈশবের পদ্মার অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে তার গড়শ্রীখণ্ড, নয়নতারা, চাঁদবেনে, মধুসাধু খাঁ উপন্যাসে। তাঁর কৈশোরের সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই কোচ রাজবংশী ছিল। অমিয়ভূষণ সহপাঠীদের নিজস্ব ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। কোচবিহার রাজে সে রাজ্যে পর্তুগীজ, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ঢুকতে না দেওয়ার ফলে প্রচুর তৎসম, তৎভব শব্দের ব্যবহার এবং সঙ্গে কোচ রাজবংশীদের সুমিষ্ট ভাষা মিশে গেছে অমিয়ভূষণের কৈশোর ও কৈশোরের ভাষায়।

পরবর্তীকালে কলেজ জীবনে তিনি ইংরেজি চর্চায় ডুবে গেলেও এই কৈশোরের ভাষা-বৈশিষ্ট্য তাঁর গদ্যকে অনেকটা নির্ধারণ করেছিল -- তিনি পঞ্চানন কর্মকার, ফোর্ট উইলিয়ামের 'শুদ্ধ বাংলা' গ্রহণ করতে পারেননি। আর পারেননি বলেই 'বিনয় বিলাস বন্দনা' উপন্যাসের গদ্যশৈলীতে এই পংক্তি ব্যবহার করতে পারেন ---- "সেদিন রাত্রিতে অনেক রাত তখন, বন্দনা বিনয়ের ঘরে গেলো।" এ যেন জীবনানন্দের কবিতার

সাধু চলিতের একাকার। আর কোচ রাজবংশীদের ভাষা ও জীবন অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ ছিল বলেই 'দুখিয়ার কুঠি' বা উপজাতির অস্তিত্ব সঙ্কট নিয়ে 'বিনদিনী' ও 'মাকচক হরিণ' উপন্যাস তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছে। যদিও অমিয়ভূষণ হুবহু ডায়লেক্ট-এ বিশ্বাস করতেন না। তিনি 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে হুবহু পাবনার ডায়লেক্ট বা 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় হুবহু আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের ডায়লেক্ট ব্যবহার করেননি। এবিষয়ে তাঁর ভাবনা ---- "ডায়লগ নতুন করে তৈরী করতে হয়, আমি সেই ডায়লগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে। কিন্তু কোন লোকালিটির নয় --- সেটা সর্বজন বোধ্য হবে।"

অমিয়ভূষণ তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম নাটক লেখেন 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই'। 'মন্দিরা' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রীঃ। ততদিনে অমিয়ভূষণের জীবনের 'একমাত্র বন্ধু' এবং লেখার প্রাথমিক পাঠক তাঁর স্ত্রী, গৌরীদেবী তাঁর জীবনে চলে এসেছেন। অমিয়ভূষণের প্রথম গল্প 'প্রমীলার বিয়ে' ১৯৪৫ খ্রীঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। লেখকের ভাষায় --- "তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে স্ত্রী আমার কাগজ নষ্ট করার অনুযোগ করায়, এক রাতে একটা গল্প লিখে তাঁর কথা মতো তাঁর নির্বাচিত পূর্বাশায় পাঠিয়ে দিই। পনের দিনের মধ্যে ছাপা হয়ে যায়, পত্রিকা ও সম্মান মূল্য আসে।" এরপর চতুরঙ্গ, ক্রান্তি, গণবার্তা, নতুন সাহিত্য প্রভৃতিতে লিখতে থাকেন। বিশেষতঃ এই লিটল ম্যাগাজিনগুলিই এই প্রতিভাধর লেখককে নিয়ে বহুকাল ধরে একক আধিপত্য করে এসেছে, তাঁর লেখক জীবনে সেই সময়ের লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সম্পর্কে অমিয়ভূষণ বলেছেন --- "পূর্বাশা, নতুন সাহিত্য, ক্রান্তি, চতুরঙ্গ ইত্যাদির সম্পাদকেরা ঠিক ব্যবসাবুদ্ধি দ্বারা চালিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা লেখককে কর্মচারী শ্রেণীর মনে করতেন না। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল সমশ্রেণীর, একরকম পার্টনারশিপ। তর্ক বিতর্ক চলতো, বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। এটা বোধ হয় আমার সৌভাগ্য যে তখন এরকম কয়েকটি পত্রিকা ছিলো।"

তবে একথা স্বীকার করতে হয়, যে টানা একটি সময় ধরে অমিয়ভূষণ লিখতে পারেননি। তার একটা কারণ, প্রকাশক বা সাময়িক পত্র তাঁর লেখা টানা একটা সময় ধরে চায়নি। তাঁকে যে লেখা থেকে সরে থাকতে হয়েছে মাঝে মাঝেই আর অনেক সময়ই সেই আত্মঅপসারণ দীর্ঘ, তারও একটা কারণ হয়তো কোনো সময়ই অমিয়ভূষণকে তেমন করে পাঠক পড়েননি। এই পাঠক বলতে কোন বড় সংখ্যা বুঝাতে চাই না। তাঁর সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার অভাব থেকে মনে হয়, বিশিষ্ট পাঠক তাঁর লেখা তেমন করে পড়েনি, তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর তাঁকে নিয়ে ছোট ছোট কাগজের উচ্ছাসে তাঁকে পড়ার খুব একটা প্রমাণ নেই। বরং, তাঁকে যেন বিগ্রহ করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। ফলে দীর্ঘায়ু অমিয়ভূষণ দীর্ঘ সময় ধরে ছাড়া ছাড়া যে গল্প, উপন্যাসগুলো লিখে গেলেন তাতে তাঁর স্বরের কোন প্রতিধ্বনি পাঠকের কাছ থেকে তিনি পেলেন না। সেই প্রতিধ্বনি তৈরিই

হল না। কোনো লেখকের বেলায় ভুল প্রতিধ্বনি তৈরি হতে পারে, বা প্রতিধ্বনি লেখকের স্বর থেকে ধ্বনি বের করে আনতে পারেনি এমনও হতে পারে। অমিয়ভূষণের বেলায় প্রতিধ্বনি তৈরিই হল না। অথচ তাকে তো আন্দাজ করে নিতে হয় এক শ্রোতা। আর বিনিময় না ঘটলেও সেই আন্দাজকেই তিনি বাধ্যত আঁকড়ে থেকেছেন। কারণ তাঁর গল্প বলার গড়নই ছিল কথা বলার গড়ন, সে গড়নে পাঠককে উপেক্ষা ছিল না, বরং শ্রোতার অপেক্ষা ছিল। যদিও অমিয়ভূষণও তাঁর কল্পিত পাঠকের ব্যবধান ঘোচেনি। বরং ১৯৮৪ তে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ তে 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই লেখককে 'বঙ্কিম পুরস্কারে' সম্মানিত করেন, ১৯৮৬ তে 'সাহিত্য একাদেমী' ২০০০ এ কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার লাভ করেন এই বিরল কথা সাহিত্যিক।

স্মরণীয় সৃষ্টি, বিশেযত ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র নির্মাণ, নিখুঁত পরিবেশ নির্মাণ, নিজস্ব রীতি প্রকরণ ও সঠিক সমাজ বিশ্লেষণ, নিজস্ব উজজ্বল গদ্যশৈলী, আঞ্চলিক ভাষায় তাৎপর্যময় উপস্থাপন, অনন্তজীবন জিজ্ঞাসার উন্মোচন, তাঁর রচনায় প্রধান শক্তি রূপে প্রতিভাত। এরকম একজন ব্যতিক্রমী লেখককে সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর সমস্ত রচনাকর্মের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের দুর্ভাগ্য অমিয়ভূষণের রচনা বাজারে সহজলভ্য নয়। বস্তুত অমিয়ভূষণ সমগ্র মানব সমাজকে তার যাবতীয় টানাপোড়েন সহ তুলে ধরেন প্রখর আত্মজিজ্ঞাসায়। এজন্য তাকে নির্মাণ করতে হয়েছে কথকতার এক নিজস্ব উপনিবেশ। ঘটাতে হয়েছে অভিনব জীবন জিজ্ঞাসার উন্মোচন। তাঁর রচনা সেজন্যই বিকৃত পাঠকের ইচ্ছাপূরণের সামগ্রী মাত্র নয়, লেখনীতে অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রথমাবধি স্বকীয় পরিশীলিত। আর সেই কারণেই তাঁর সৃষ্টি শুধু পাঠককেই নয়, অন্যান্য লেখকদেরও তাড়িত করে। তাড়িত করে আমাদেরও। যার পরিণতিতে তাঁর উপন্যাস ও গল্পে উদ্বাস্তু মানুষের পথচলার সন্ধান।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা' (১৩৯৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন --- "উনিশ শতকের মানুষের কাছে দুনিয়ায় ছিল, যা মনে হত, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষের কাছে দুনিয়া মোটেই তা নয়, জীবনবোধটাই পালটে গিয়েছে। বিশ্বাসের ভাঙনে মানুষ আজ নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো, মানুষ আজ সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।"[১] লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার ইতিহাসের এই পালাবদলের একজন প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। পাবনা জেলার সুখশান্তির নীড় থেকে ছেলেবেলাতেই তাকে চলে আসতে হয়েছিল আধুনিক সংস্কৃতিক পরিচয় নেওয়ার জন্য। তবুও ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট কিলিং'-এর দুঃস্বপ্নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। পরবর্তী সময়ে গ্রাম থেকে তাঁদের পুরো পরিবারটি বাস্তুহারা হয়ে চলে এসেছিল কোচবিহার শহরে। এই গ্লানি তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনেই যেন বারে বারে উঁকি দিয়ে যায়। অনেক লেখাতেই ঘুরে ফিরে আসে উদ্বাস্তু মানুষের দল, তাদের জয়

পরাজয়ের চেতনার ছাপ। নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অবহেলিত মানুষের দল, যাদের জীবনে রয়েছে শুধুই ক্লেদ, লেখকের সযত্ন সৃষ্টি যেন তাদের বাঁচার দলিল। ঘরহারা মানুষ বারেবারেই ফিরে পেতে চেয়েছে তাদের নিজস্ব বাসভূমি যেখানে, এক নিশ্চিন্ত পরিমণ্ডলে তারা আবার ফিরে পাবে তাদের স্বাধীন গেরস্থালী, নিজস্ব চিত্তবৃত্তি, মাটির দুর্নিবার আকর্ষণে তারা বরণ করে নিয়েছে হাজারো দুঃখ কষ্ট, পথচলার নিদারুণ যন্ত্রণা, তবে শুধুমাত্র বাসভূমির ক্ষেত্রে নয় এর দোলা লেগেছে মানুষের মনন ধর্মেও। নিজস্ব বিশ্বাসের সুস্থিত ভূমিটি বিচ্যুত হলে সেও তো এক ধরনের উদ্বাস্তু জীবন, সেখানে ফেরার জন্য মানুষের তখন সাধনা শুরু হয়, এই সাধনারই অন্য নাম হলো আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় --- "নিঃসঙ্গ মানুষের উৎকণ্ঠা, উৎক্ষেপ ও বেদনা, নিঃসঙ্গ মানুষের চক্রাকার আত্ম পরিক্রমা, বিচ্ছিন্নের যথার্থ গোলক ধাঁধায় ঘেরা, এ হল বিংশ শতকীয় আধুনিকতার প্রধান এবং বিশিষ্ট একটি গোত্র।"[১]

অমিয়ভূষণের 'গড়শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর, ৪৬-এর দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের আঘাতের মধ্যে পদ্মানদীর ধারের পাবনা জেলার চিকন্দি, বুধেডাঙ্গা, চরণকাশি, মানিকদিয়ার গ্রাম আর বন্দর দিঘাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মানব জীবনের অভিঘাত বর্ণনা করা হয়েছে। সময়ের সমগ্রতাকে স্পর্শ করে যে জীবন বয়ে চলে জয় পরাজয়ের রথচক্রের মধ্যে যার সর্বদা অবস্থিতি তাই হবে মহৎ সাহিত্যের উপজীব্য। এই উপন্যাসে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। সময়ের ভাঙাগড়ার তীরে মানুষ সমষ্টিগতভাবে যে বেঁচার চেষ্টা করে তারই শিল্পরূপ 'গড়শ্রীখণ্ড'। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে যেমন জীবন এখানে পরিস্ফুট তেমনি এটাও পরিস্ফুট সেকালের আঘাতে সেই জীবন কেমন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা আর দেশ ভাগ মানুষের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে কেমন করে ওলট পালট করে দিল, তবে ভূমি উৎখাত মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছিল যদিও এ সবকিছুকে অস্বীকার করে নদীর নতুন চর জাগার মতন তাদের নব প্রত্যাশায় এগিয়ে চলার আশ্বাসও লেখক আমাদের শুনিয়েছেন।

'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি মনযোগ দিয়ে পড়লে এর ভেতরে তিন ধরনের মানুষের কথা জানতে পারা যায়, সাহিত্য সমালোচনা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি আলোচনা প্রসঙ্গে এই রকম অভিমত পোষণ করেছেন। সুরো, ফাতেমা সান্দার, রজব আলী, জয়নাল, টেপি, টেপির মা, মাধাই-এরা প্রথম শ্রেণির। যাযাবর সান্দার গোষ্ঠীর মানুষ এরা অনেকেই। স্বভাবে অপরাধী এই সান্দার গোষ্ঠী। তবে দুর্ভিক্ষ এদের গায়ের মেদ কেড়ে নিয়েছে। সুরতুন-ফাতেমা-ফুলটুসিরা ট্রেনে চাল চালানের অবৈধ ব্যবসা করে, মাধাই বিষ দিয়ে গরু মেরে তার চামড়া বিক্রি করে, টেপি নিজেকে বিক্রি করে অতিরিক্ত সুখ কিনতে চায়, টেপির মা পেটের দায়ে এক বৃদ্ধ বৈরাগীর জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হয়ে পড়ে। যে হালদার পাড়ার ছয়ঘর মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে সেই

পাড়ায় তাদের বাস। আর রামচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, মুঙলা, ভানুমতী, ছিদাম, পদ্ম, আলেফ, এরফান-এরা দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত পরিশ্রমী মানুষ। তার মধ্যে রামচন্দ্র এই মাটির বলবত্তম সন্তান, তাই চাষবাস রামচন্দ্রের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের হেতু নয়, জীবনের উদ্দেশ্যেও বটে। সে পারলে পৃথিবীকে চষে ফেলে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, জমি অনেক দেখি চাষা দেখিনা। খরা মন্বন্তর বন্যা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অপরাজেয় চিরন্তর কৃষক এই রামচন্দ্র, একবার নয়, তিনবার সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা, তারপর দেশভাগ, পরপর তিনটি আঘাতে চাষবাসের স্বচ্ছলতা এদের জীবন থেকে সরে গেল। অন্যদিকে সান্যাল মশায়, অনসূয়া, নৃপনারায়ণ, মনসা, সুমিত এরা তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। অভিজাত পরিবারের লোক। জমিদারি বৃত্তির অবক্ষয়ের শেষ বৃন্তে এদের অবস্থান। কালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সান্যাল মশায়কে তাই ভাবতে হয় এই গ্রামে তিনি অবাঞ্ছিত, এখানকার জীবনের সাথে তার যোগ নেই, কি হবে তার নতুন ঘর বাড়ি তৈরি করে --- "গণগামিনী পদ্মা তাদের প্রতি বিমুখ, কালের স্রোত এবং পদ্মা তাদেরকে পরিহার করেছে।" তাই গ্রাম ছেড়ে এদেরও চলে যেতে হয় নতুন জীবনের সন্ধানে। সান্যাস মশাই চেয়েছিলেন যে হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি একই কালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। কৃষকদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মিশ্রিত সম্ভ্রম নিয়ে প্রাচীন ভূঁইঞাদের মতো বীরত্বে শেষবারের মতো রুখে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না। কেননা কালের আঘাতে সান্যাল মশাইকে ক্ষতবিক্ষত পরাজিত হয়ে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে নতুন এক জীবনের সন্ধানে। গড়শ্রীখণ্ড ছেড়ে নতমস্তকে নতুন আশ্রয়ের দিকে যে সান্যাল মশাই চলে যান তিনি তখন জীবনের মূল স্রোত বিযুক্ত নিঃসঙ্গ পরাজিত এক মানুষ। দেশভাগ দুর্ভিক্ষ মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন একাকী করে দিয়েছিল। জমিদার সান্যাল মশাইয়ের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন ---- "রামচন্দ্র কাছারিতে প্রবেশ করলো দুঃসময়ে, কাছারির অর্ধেক দরজা বন্ধ। সান্যাল মশাইয়ের খাস কামরার দরজায় মস্ত বড়ো একটা তালা ঝুলছে। কাছারিতে দাঁড়িয়ে অন্দরমহলের দোতলার যে জানালাগুলি চোখে পড়ে সেগুলিও বন্ধ। দুপুরের মতো তাজা রোদে এটা ঘুমের দৃশ্য হতে পারে না। এতক্ষণে অন্তত একজন বরকন্দাজেরও দেখা পাওয়া উচিত ছিল। বরকন্দাজ এল না, আমলারা কোথায় ? প্রজারা সব শুনশান দিগরের গোরস্থান। নায়েব নিজেই বেরিয়ে এলো কাছারির একটা ঘর থেকে, নায়েবের হাতে হুঁকো, সে যেন বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে, রামচন্দ্রের মনে হলো মুঙলা নায়েবের সঙ্গে যে কলহ করেছে সেটা মিটিয়ে ফেলা উচিত, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটাকে মূল্যহীন বোধ হলো।

"নায়েব বললো, তুমিও বুঝি সেই খবরটাই চাও ? অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে"।

কী খবর ?

খবরটা সত্যি। কর্তা আর গিন্নি চলে গেছেন দেশ ভ্রমণে।"

রামচন্দ্র এত বড়ো নির্দয় সংবাদ আশা করেননি। অভিভূতের মতো সে বললো, 'ছাওয়ালরা' ?

"তার আগেই গেছে। দেশ ভাগের কথা শুনলে, রামচন্দ্র ?

রামচন্দ্রের মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেউ তার বুকে চেপে বসেছে।"৬

আবার 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের চরিত্রগুলির দিকে যদি ফিরে তাকাই তাহলে চোখে পড়বে প্রতিটি চরিত্র কোন না কোনভাবে উদ্বাস্তু কিংবা নিঃসঙ্গ হতাশা ও গ্লানির মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করছে। যে সুমিতি সান্যাল বাড়িতে প্রচলিত সমস্ত নিয়ম ভেঙে গর্ভবতী অবস্থায় প্রথম নববধূ হিসেবে প্রবেশ করেছিল, চেয়েছিল এতদিনের বদ্ধ খাঁচাটায় একটু নতুন আলো প্রবেশ করুক তাকেও সন্তান সাথে করে চলে যেতে হলো কলকাতায়। হয়তো বা সেখানে নতুন কোন আরম্ভের সূত্রপাতের সম্ভাবনায়। আর রামচন্দ্র খরা মন্বন্তর বন্যার মাঝখানে চাঁদ সওদাগরের মতো যে দৃপ্ত পৌরুষে ভাস্বর। তাকেও দেখি কালের অভিঘাতে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনায় মথিত হতে, তাই বোধ হয় রামচন্দ্র পদ্মকে ছিদামের কাছ থেকে নিজের জীবনে টেনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। আর ছিদাম যে কিনা পদ্মকে নিয়ে ঘর সংসার করার স্বপ্ন দেখে দিবারাত্রি কাজে মনযোগ দেয়। কিন্তু যখন দেখল তার জীবনে পদ্মকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, তখনই নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। যার পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে ছিদামের। কেষ্টদাস যে সংসার জীবনে সুখী হয়েও শেষ জীবনে পদ্ম বৈষ্ণবীকে নিয়ে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু বার্ধক্য তাকে ঘিরে ধরেছে। ফলে যৌবনে টুলটুল পদ্ম পুত্রসম ছিদামকে সঙ্গ দিয়ে কিংবা সঙ্গ নিয়ে জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখে, কেষ্ট তা বুঝতে পারে। কেননা পদ্মকে দিয়ে তার নিঃসঙ্গতা ঘুচে না। তাই কেষ্ট দাস একদিন সমস্ত কিছু ছেড়ে নবদ্বীপে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ে। আর মুঙ্লা ও ভানুমতীকে নিয়ে বর্ধমান চলে যেতে চায়। কেননা, দেশ ভাগ, দাঙ্গা আর নিঃসঙ্গ জীবন এইসব চরিত্রগুলিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে।

অন্যদিকে সুরতুন যে কিনা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সব হারিয়ে চালের চোরাকারবারী। আর একজন পরিপূর্ণা নারী। পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে চুলের জট ও নোংরা শাড়ি পরিহিতা সুরো দিঘা রেল স্টেশনের পোর্টার মাধাই বায়েনের চোখে কামনার মদিরা ছড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে মাধাইকে গ্রহণ করতে পারেনি। উপন্যাসের শেষ দিকে দেখি বন্যার জলে চারপাশ ভেসে গেলে রোগে অথর্ব মাধাইকে রক্ষা করার চেষ্টায় সুরতুন আর ইয়াজ জল ঠেলে এগোতে লাগল, তখনই সুরতুনের মনে হলো এই জীবনে বাঁচার অর্থ কি ? কিন্তু ইয়াজ আশ্বাস যোগায় যে সে চাষবাস করে আহার্য সংগ্রহ করে জীবন প্রবাহ সচল রাখবে। এখানেই লেখক পরাজিত জীবনে নব সম্ভাবনার স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। আর সুরতুন চরম দুর্যোগের মধ্যে শরীর মনের এতকালের জমে থাকা শীতলতা কাটিয়ে উঠতে পারল। দুর্যোগের দিনে সর্বস্ব হারিয়ে চোরাকারবারী এবং নিঃসঙ্গ জীবনের অধিকারী হলেও ফাতেমার নারী সত্তা কিন্তু বিনষ্ট হয়নি। তাইতো ফুলটুসির ছেলে সোভান আর জয়নালকে মাতৃস্নেহে নিজের আঁচলে মানুষ করতে চেয়েছিল। চিরন্তন সুপ্ত এই মাতৃসত্তাই তাকে একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। আবার আলেফ শেখ যে কিনা অবসর জীবন কাটাতে এসেছিল গ্রামে,

এসেছিল নিশ্চিন্ততার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে, সেও জীবনের খেই হারিয়ে ফেললো। কলকাতার দাঙ্গায় ডাক্তারি পাঠরত একমাত্র ছেলে সাদেক মারা গেলে উন্মাত্ত হয়ে পড়েছিল আলেফ শেখ। জীবনটাই যে এত শূন্য হতে পারে তা তার জানা ছিল না। আর মাধাই নিঃসঙ্গ জীবনে সুরতুনকে নিয়ে ঘর করবার বাসনায় তাকে সাজিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সমাজ তা হতে দিল না, নিরুপায় মাধাই জীবনে স্থিতি পেতে বারবণিতার সঙ্গ উপভোগ করে। ফলে বহু কঠিন রোগে পীড়িত হয়ে সেই নিঃসঙ্গ জীবনে আবার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই সন্ন্যাসীর আদর্শতা অনুভব করে, এটাই তার জীবনের মহত্তর উত্তরণ।

নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা-বিযুক্তি-সম্পর্ক স্থাপন প্রয়াস সফলতা বা ব্যর্থতা, আধুনিক সাহিত্যের এই বৃত্তটিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন অমিয়ভূষণ। সর্বোপরি মূলহীন মানুষের উদ্বাস্তু চেতনার উপলব্ধিটিকে ‘alienation’-এর প্রতীক হিসেবে নানা জায়গায় উপস্থাপিত করেছেন তিনি। গদাধর নদীর তীরে ছোট একটি জনপদ, নাম ‘দুখজাগানিয়া কুঠি’। চলতি ভাষায় ‘দুখিয়ার কুঠি’ বলে লোকে, নামকরণের নিঃসঙ্গতা ভোটদের স্মৃতি বিজড়িত নাকি পরবর্তী কোনো ইতিহাস সম্পর্কিত তা নিয়ে আজ আর নিঃশংসয় হওয়া চলে না। কাহিনির একদম শুরুতেই নাম থেকে এক ধরনের নিঃসঙ্গতাবোধ আমাদের গ্রাস করে। আমরা লেখকের সযত্ন প্রোথিত ইঙ্গিতে অনুমান করি এ হবে এমন এক আকল্প যাতে লেখা হবে গ্রাম আগ্রাসী নগরায়ণের ইতিকথা, আধুনিকতার পদচিহ্নের কথা, সহজ করে বললে বলা যেতে পারে যে পরাজিত ভোটদের দীর্ঘশ্বাসের বেদনা বহন করে জেগে আছে দুখিয়ার কুঠি। কুঠি বাড়ি কোন ইঁট কাঠের ধ্বংসাবশেষ নয়। বিজয়ী প্রদেশপালের স্কন্দাবার তৈরি হয়েছিলো বাঁশের চাঁচারি দিয়ে। কিন্তু ব্যাধির নিষ্ঠুর করাল স্পর্শে কুঠি কেন্দ্রিক নগর বিনষ্ট হয়ে লোকের মনে দুঃখ জাগতো। তাইতো নাম দুখজাগানিয়ার কুঠি। নিঃসঙ্গতা আর কাহিনির নামকরণ আমাদের কাছে প্রায় একার্থক। আর নগরায়ণের প্রতীক পীচের সেই কালো রাস্তা যা বেয়ে একরাশ সবুজ মাখা গ্রামের দলদলে কাদার মধ্যে উঠে আসে। কুৎসিত কদর্য নগর আর তার হৃদয়হীন শঠ মানুষগুলো, সেই সড়ক চলমান কোনও সত্তার মত গ্রামবাসীদের একমাত্র আশ্রয় জমিকে গ্রাস করে। স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, “সব ফুরিয়ে গেলে মানুষও খাবে নাকি তারা ?” ফুলবর তাই সড়ককে সাপের মতো দেখে। লোভ, সড়ক আর সাপ এদের মধ্যে তফাৎ করা যায় না, রাস্তা তৈরির স্টিম রোলার নির্মম ভঙ্গিতে সব বাধাকে যেমন চূর্ণ করে দিয়ে এগিয়ে যায় সেই রকম বিদেশি মানুষের স্রোত এগিয়ে আসছে গদাধরপুরের দিকে, “দুখিয়ার কুঠির উপর দিয়েই সে স্রোত বয়ে যাবে। দুখিয়ার কুঠি আর থাকবে না।” বিশ্ব জোড়া অভাববোধের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলো দুখিয়ার কুঠি, মানুষজনের বিপন্নতা, জন্ম নিল আধুনিকতা, বেদনা-বিপন্নতা-নিঃসঙ্গতা যার অন্য নাম।

উপন্যাস পাঠে আমরা দেখি মহকুমা সদর গদাধরপুরের বদন মাস্টার চরিত্রটি উদ্বাস্তু আত্মসত্তা

লাভ করেছে। অতীত জীবনের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা তাকে অপ্রাপ্তির তীব্র ক্ষোভেস্বজীবন থেকে উৎখাত করে দেয়। তাই ফেলে আসা জীবন সম্বন্ধে সে পাষাণ নির্বাক, সংসার জীবনের প্রতি সুতীব্র অনাসক্তি তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য। দশ বছর ধরে এই শহরে এসে সে কোনও এক দোকানদারের বাড়িতে থাকে। নিরাশ্রিত মানুষ, গোত্রহীন আশ্রয়, নিঃসঙ্গতার হাত ধরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বদন মাস্টারের পথচলা, উদ্বাস্তু মানুষের পথচলা। মাতালু কৌম জীবন থেকে অনেক সরে গিয়ে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল। নিজের উত্তরাধিকার মালতির কাছে রেখে যাবার সময় সে বুঝতে পারেনি যে এভাবে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব নয়। সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে নেমে আলে কৌম জীবনের সঙ্কট, ভূমি-বিনষ্টি-শস্য-বিনষ্টি তাদের জীবনকে বেদনার্ত করে তোলে, পথ ছেড়ে দিতে হয় সভ্যতার নিষ্ঠুর কালো পিচ রাস্তার জন্য, যা কিনা সর্বনাশী নগরায়ণের দিকে তাদের টেনে নিয়ে যায়। কৌম জীবন প্রতিবাদমুখর হতে চায়। যদিও সে সাধনা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই পাকা সড়কের বিস্তারের সাথে সাথে নায়েব আহিলকার যেদিন মনে হয়েছিল শহরটাই লুপ্ত হয়ে গিয়ে একটা শ্রমিকের উপনিবেশ তৈরি হয়ে এসেছে, সেদিন এক নিরুপায় ব্যথায় তার অন্তর ভরে উঠেছিলো, কৃষিজীবি মানুষের প্রতিভূ হিসেবে উপলব্ধি হয়েছিল --- "সে যেন কোনো কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার নায়ক ও নেতা, বলবত্তর আর এক সভ্যতার কাছে চূড়ান্তভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এই তার ভাগ্য।" [৪] আর সে দিনেই নিঃসঙ্গতার সুতীব্র অনুভবে নায়েব আহিলকার তার অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

সভ্যতার অগ্রগতির অন্য নাম বোধ হয় আগ্রাসন। কবি জীবনানন্দের ভাষায় ---- "পৃথিবীতে সুদ খাটে, সকলের জন্য নয় / অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজনের দু-জনের হাতে / পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে / সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায় / বাকী সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন / কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।" [৫] এই আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াই রক্তমাংসের জীবনের উষ্ণ স্বাদ পেতে চায়। উন্মূলিত মানব সমাজ অধিকারভোগী নিষ্ঠুর আধিপত্যের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে পড়ার গর্জন তোলে। শোষকের চাপে পড়ে যে সুকুমার প্রবৃত্তি ভাঙতে শুরু করেছিল আত্মশক্তি দিয়ে মানুষ তার উর্ধে উঠে জয়গান গাইবার চেষ্টা করে। ফলাফল যাই হোক না কেন এই যে আত্মোপলব্ধি, মিথ্যা রহস্যময়তাকে সরিয়ে দুচোখ মেলে দেখবার চেষ্টা, এওতো এক ধরনের ফিরে আসা। সাধকের উপলব্ধি যেমন করে সংসারে ফিরে আসে, গৃহীর উপলব্ধি যেমন করে সাধনায় ফিরে যায়। নিরাশ্রিত জনমণ্ডলীর এমনই এক আশ্রয় উপলব্ধির কথা 'মহিষকুড়ার উপকথা'।

মহিষকুড়ার চারদিকে যে বন সে বন এখন আর আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল নয়, "সব বনই কারো না কারো" ছ-বিঘা জমি চাষ করতো আসফাকের বাবা। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পর

আসফাক শুনেছে এবার সেই জমিতে নতুন আধিয়ার বসাবে বুধাই। প্রথমে জমি তারপর নিজের ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ মমতার সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে গেল আসফাকের জীবন থেকে। বাস্তুহীন, আশ্রয়হীন, নিঃসঙ্গ আসফাকের সেই পথে নামা, তাই বনে আশ্রয় নেওয়া আসফাক অরণ্যের মত সবল হয়েও থাকতে পারে না। লটা-ঘাস, কুশবন আর নীল মেঘের মত পাহাড়ে যেসব সবল মর্দা মোষ প্রাণশক্তিতে দুর্বার হয়ে ওঠে তা আসফাকের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠে না। সভ্যতা যেন তাকে বলে "দূরে যাও, আড়ালে যাও, এখানে কিছু নেই"। ফলে তীব্র ক্ষুধার পীড়নে অন্যের জমি থেকে শশা ফলমূল খেতে হয়েছে তাকে। যেতে যেতে বনের ধারে তাঁবু খাটানো একদল বেদের সাথে সাক্ষাৎ হলো, সেখানে আবিষ্কার করলো তার ছয় সাত বছরের বড় কমরুনকে। সদ্য স্বামীবিয়োগ হয়েছে তার। দলের অন্য সবাই বসন্তের ভয়ে তাকে ফেলে পালিয়েছে। উন্মূলিত আর একটা জীবন। দুটি জীবনই তখন সব হারিয়ে বসে আছে। তারপর এলো সেই সন্ধিপূজার লগ্ন, যেদিন নদীর জলে কমরুনের শরীর দেখল সে ---- "সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর"। স্বপ্ন দেখে দুজনই, কমরুন নিজের সত্তায় আসফাককে প্রোথিত করে আশ্বাস দেয় বুঝি বা নিজেও আশ্বাস পেতে চায়।

কিন্তু যখন অরণ্যে 'গরম পীচ ঢেলে সড়ক' তৈরি হয়, শুরু হয় আগ্রাসন। তখন কিছুই আর অরণ্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এক বলবান সমাজের কর্তৃত্বের মুঠোর ভেতর সবকিছু চলে যায়। চলে যায় কমরুন ও বীর্যহীন জাফরের 'বিবিসাহেবা' হয়ে। আর জাফরুল্লার প্রভুসুলভ আধিপত্য ও পরাক্রম আসফাককে ক্রমশ ক্রমশ নির্বীর্য করে চলেছে। লিঙ্গশাতনের দুঃস্বপ্ন দেখে সে। অধিকারবোধ থেকে সরে গিয়ে একাকী হয়ে যায়, অসহায় হয়ে পড়ে, হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। আবার নির্বীর্য জাফরকে বীর্যবন্ত করে তোলার জন্য আসফাক ঔষধ আনতে গিয়ে অরণ্যে পথ হারিয়ে আদিম মানুষ হয়ে যায়। তাই সে মর্দামোষের মত ডাক দিতে দিতে বনবাদাড় ভেঙে ছোটে। রক্তের মধ্যে যেন বুনো বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে। কিন্তু সে ডাক ব্যর্থ হয়ে যায়। সভ্যতা উপস্থিত করায় কালো লেল্যাণ্ডের ট্রাক। এক মানুষ দেওয়াল তোলা, কাঁধ উঁচু উঁচু চাকা, কুচকুচে কালো রং-এর কলের মোষ। বনের মোষ তার সাথে লড়াইয়ের সাধ্য নেই, আসফাক পরাজিত হয়, কমরুনকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আদিম কৌম জীবন সভ্যতার পাকা সড়কের কাছে পরাজিত হয়ে অসহায় নিঃসঙ্গতায় ভোগে। এ দ্বৈরথ অসম। ফলে নিঃসঙ্গ আসফাক, জাফরুল্লা এবং সঙ্গ থেকেও যার নেই সেই কমরুন নিঃসঙ্গ দুঃখের অসহায়তায় ক্লান্ত বিষণ্ন হয়ে ছবির মতো যেন স্থির হয়ে আছে।

কোচ, রাভা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সঙ্কট এবং তার ফলশ্রুতিতে নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম। উত্তর বঙ্গের আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের প্রবল আগ্রহ ছিল বলেই

এই আদিম জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনকে অঙ্গে ধারণ করে রচনা করেছেন 'মাকচক হরিণ' উপন্যাস। উপনিবেশোত্তর জনজীবনে কৌম সত্তা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য, নগরায়ণ সে সত্তাকে সামগ্রিক এক ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। হ-সাম (পৃথিবী, তৃণ, তৃণাচ্ছন্নভূমি) নারী হারিয়ে নিঃসঙ্গ রাভা জীবন। উত্তর বঙ্গের রাভা অধ্যুষিত একটি গ্রাম 'হাতিতল্লি জোড়া'। সেখানকার রাভা জনজীবনে পরিবর্তনশীল কালস্রোতে নেমে এসেছিলো সঙ্কটের কালো মেঘ। রাভা জনসমাজে মেয়েরা জমির মালিক, কিন্তু লাভের বাস্তবতাকে মানতে গিয়ে রাভা পুরুষেরা নিজ ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। গোত্র সমস্যায় বিবাহযোগ্যা কন্যা না পাওয়ায় দলে দলে রাভারা আসাম প্রদেশে অন্য রাভাদের খোঁজে দেশ ত্যাগ করেছিল, ফলে তাদের ভাষা সংস্কৃতি, বাংলা, ইংরেজি, রাজবংশী ও অন্যান্য ভাষা, সংস্কৃতির নীচে চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। সামগ্রিকভাবে দেখলে এ হলো কৌম গোষ্ঠীর অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলার ইতিহাস। যাকে আমরা উদ্বাস্তু জীবন ইতিহাস বলতে পারি। জমি না থাকলে রাভা নারীর অস্তিত্ব থাকে না, রোপনহীন-প্রজননহীন জমি, নিষ্ফলা নারীর কাছে ফিরে আসা এক অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। রাভা পুরুষ জানে তার কৌম জীবনের পরম্পরায় একমাত্র ধারিকা শক্তি নারী, নারী 'চিকাবায়রাই' উচ্চারণ করে রাভা জীবনের প্রকৃত পরিচয় উন্মোচন করতে পারে। এসব লোকজ সংস্কার ভিত্তিক মানব জীবনের একটি গোষ্ঠীর জীবন্ত দলিল 'মাকচক হরিণ'।

আর 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জন কেইঝ যার আসল নাম জনাদন। গোপালগঞ্জের 'ব্যাপটিস্ট মিশন হাউস' যাকে নিজস্ব রাভা সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করেছিলো। জোন ম্যাডাম যাকে শিখিয়েছিল ---- ভাষা শুধু চিন্তাকে ধরে রাখে না, জাতির ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিত্বের অবস্থান কোথায় তাও ধরে রাখে। একটা জাতির মৃত্যু আর একটি ভাষার মৃত্যু প্রায় একই কথা। সেই রাভা ভাষা যখন সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগমনে আর অবিকৃত রইলো না, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টধর্ম যখন রাভাদের প্রাচীন অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য করলো, জন্ম নিলো এক অসহায় সংস্কৃতিহীন বেদনা, আদিম সংস্কৃতিহীন এক আধুনিক শূন্যতা, অবশ্য পূজক, সূর ও মাসাং পূজক রাভা জীবনের শূন্যতা। স্ত্রী বিন্দে মা হতে গিয়ে উজ্জ্বল ঝর্ণার সাথে মিশে গেলে নেমে এসেছিল আরো এক শূন্যতাবোধ, বিচ্ছিন্ন নিরাশ্রিত, নিঃসঙ্গ জনাদন আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইলো কৌম সংস্কৃতির কাছে, 'মাওরিয়া বেটা' জনাদন 'কিলাংনানি' প্রথায় বিনদনি-র কাছে আশ্রয় পেতে চায়, ফিরে পেতে চায় নারী, জমি আর সংস্কৃতির অধিকার। আধুনিকতার কাছে তার সে আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। জমির অধিকার নিতে গিয়ে শাসকের গুলিতে জনাদন চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে যায়।

আধুনিক বর্গা আইন, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা এবং শাসক শক্তি তার শেষ ঘন্টার আয়োজন অনিবার্য করে তুলেছে। সংস্কৃতিহীন কৌম মানুষের দ্রোহ বাতাসে করুণ অসফল আর্তি রেখে মিলিয়ে যায়, সে

আর্তির একটিই নাম নিঃসঙ্গতা।

রাজনীতি বর্তমান মানব জীবনে এক অপ্রতিরোধ্য সত্য। তা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাপেক্ষ নয়। না চাইলেও মানুষ রাজনীতির দাবার চালের ঘুঁটি হয়ে যায়। 'নিবার্স' উপন্যাসে রাজনীতি উদ্বাস্তু মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে না, এই সত্য প্রতিপাদ্য হলে বিচ্ছিন্নতার পদধ্বনি বয়ে নিয়ে আসে। হলুদমোহন ক্যাম্পে যেসব মানুষ ছিন্নমূল হয়ে, জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় পেতে চেয়েছিলো। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম কেউই তাদের তা পেতে দেয়নি। রাজনীতি, ধর্মের পরিচালকদের হাতের পুতুল হয়ে নিঃসঙ্গতার শূন্যতার মধ্যে ভাসতে হয়েছে নতুন জীবনের খোঁজে। এদের বাস্তু গেছে এটাই শেষ কথা নয়, সব মনুষ্যত্ব মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়েছে এটাই শেষ কথা। উপন্যাসের মুখ্য আশ্রয় এক উদ্বাস্তু নারী চরিত্র বিমি বা বিমলা। দেশ বিভাগের আগুনে বিমি দগ্ধ হয়েছে। যাযাবরের মতো আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে। সাময়িকভাবে হলুদমোহন ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প ত্যাগ করে পৃথক বাড়িতে উঠে গেছে। তার স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এদেশে উদ্বাস্তু আগমনের বিপজ্জনক কাহিনি, তার চিন্তা-ভাবনায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় চিত্রবৎ প্রত্যক্ষ হয়েছে উদ্বাস্তু জীবনে দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা। বিমির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে উদ্বাস্তু জনতার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের অপপ্রয়াস। তার সহানুভূতিশীল হৃদয়ে এবং বৌদ্ধিক চেতনায় উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছে দু-একটি উদ্বাস্তু চরিত্রে অসামান্য ধর্ম।

উপন্যাসের অনবদ্য অন্য চরিত্র মরণচাঁদ সহজ সরল ও বিবেচক চরিত্র। তার শালীনতাবোধ, সাহস ও প্রতিবাদী ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দেশ ভাগের পরে উদ্বাস্তু মরণচাঁদের সঙ্গে বনগাঁ স্টেশনে দেখা হয়েছিল বিমির। বিমিও দেশ ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধান করছিল। অসহায় নিঃসঙ্গ সেই যুবতী নারী মরণচাঁদকে অনুরোধ করেছিল সঙ্গে নিয়ে যেতে। সময়টা এমন ছিল যখন সবাই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত, কিন্তু মরণচাঁদ কথা রেখেছিল, প্রলুব্ধ পুরুষদের লালসা থেকে তার মা ঠাকরুণকে (বিমি) রক্ষা করতে নানা কৌশল ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পৌছানোর পূর্বে অসুস্থ বিমিকে মরণচাঁদ কাঁধে তুলে নিয়েছিল। দিয়েছিল আশ্রয় এবং নিরাপত্তা। যা বিমির পক্ষে জীবনদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বনগাঁ স্টেশনের মরণচাঁদ, বন্যার্ত মরণচাঁদ, শহরে পৌঁছে যাওয়া মরণচাঁদকে আমরা দেখেছি তার সাংস্কৃতিক অতীতে ফিরে যেতে। আর দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হওয়ার আগের মুহূর্তের মরণচাঁদ সে তো অতীতকে আঁকড়ে ধরে বিক্ষত হচ্ছে। পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দণ্ডকারণ্য ভালো কি খারাপ, সে প্রশ্ন তো পরের, আসল কথা দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার কথায় নিজের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলার শঙ্কা। সমাজ বিজ্ঞান তেমন করেই ভেবেছে --- "The reluctance of the East Pakistan refugees to leave West Bengal for inhospitable Bihar, Orissa and Dandakaranya can to a very large extent be explained by a lively apprehension of possible loss of their

identity as distinct cultural group।"[৩]

উদ্বাস্তু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রণবীর সমাদ্দার তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছেন ---- "The single most important contribution of the 1951 convention was that it made the refugee a victim knowingly it celebrated victimhood।"[১] এই victimhood-এর প্রশ্নটি আবার বিমির রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসে, মরণচাঁদের নোয়াখালি, বাগেরহাট, খুলনা ছেড়ে চলে আসার ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য, বিমির বরিশাল ছেড়ে বনগাঁ স্টেশনে চলে আসার ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়। 'Persecution of life' নয় 'belief and opinion' ও নয়, নেহাত বেঞ্জামিনের ভালোবাসা, হয়তো শরীরী লোভে এসবের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই বরিশাল ছেড়ে চলে এসেছিল বিমি। অথচ এই বিমিই সোয়েথওয়েটের আবাসের জন্যে বড়বাবুর শরীরী লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল হয়তো। আসলে বিমি বলে যে বাস্তবতা তা বহু খণ্ডে বিভাজিত। বিমি বলে কোন একটি বাস্তবতা নেই। এবং প্রতিটি খণ্ড বিমি বাস্তবতাই তার পরিমণ্ডলে বিচ্ছুরিত কল্পনার জন্ম দিয়েছে। মরণচাঁদের পরিমণ্ডলে, মোহিতদের পরিমণ্ডলে, বেঞ্জামিন, সৌম্য, বড়বাবু এবং ভুবনবাবুর পরিমণ্ডলে এক একটি বিমি খণ্ড কল্পনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। সে বিমির ব্যক্তিত্বের জাদু। এমনকি হয়তো শরীরী রূপেরও। কোনো একটি পরিমণ্ডলে বিমি তার সমগ্রতায় ধরা দেয়নি, সমগ্র বিমি বলে হয়তোকিছু হয়না, প্রত্যেকটি খণ্ড-বিমি। ভগ্ন বিমি, অপূর্ণ বিমির ওপারে রয়ে গেছে অনেকগুলি বিমির স্তর। সবার সামনে যে বিমি দেখা যাচ্ছে সে হয়তো আসল বিমি নয়, নেহাত বিমি বলে কল্পনা। যার জন্ম উদ্বাস্তু জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্য থেকে।

'চাঁদবেনে' ভিন্ন মাত্রার এক ভিন্ন কাহিনি বাংলার পাঠকদের কাছে বয়ে নিয়ে এলেও আসলে তা জীবনের উৎসার থেকে সরে আসার এক ভিন্ন গল্প। কাহিনির পরিসমাপ্তি বিপুলা পৃথিবীতে কিছু খুঁজে চলে। সে অন্বেষণ সময়ের মানদণ্ডে এক নবতর মাত্রা ধারণ করে। থেকে যায় প্রতীক্ষার মালা, সেই মালায় উঠে আসেন সনকা তার পুত্রদের সাথে। উঠে আসেন স্বয়ং চাঁদ এমনকি সময় কিংবা মহাকাল নিজেও। প্রতীক্ষার নৈঃশব্দে উঠে আসে একাকীত্ব। ভাগ্য প্রতিস্পর্ধী চাঁদবেনে মৃত্যু থেকে নবজীবনের অনুসন্ধানে নিঃসঙ্গ ভেলাটি ভাসিয়ে বয়ে চলে যান। সে যাত্রায় তিনি একক পথিক। 'বিলাস-বিনয়-বন্দনা' উপন্যাসে বিনয় বন্দনাকে পাবার সুতীব্র ইচ্ছাতে যখন বাধা দিতে চায় তখনই উদ্ভূত হয় 'কবিতার বিষাদ' যা কিনা নিঃসঙ্গতার অন্য নাম। আর বিলাস যখন আত্মপরিচয়ের গ্লানি লুকিয়ে ফেলতে পালিয়ে বেড়ায় জীবন থেকে, বন্দনার কাছ থেকে, তখন কি উটের গ্রীবার মতো প্রলম্ব নিঃসঙ্গতা নেমে আসে না জীবনে ? 'বিবিক্তা' উপন্যাসে বুদ্ধিজীবি উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনের অসাড়তা, মিথ্যাচারের কথাকাব্য যে জীবন কাঙ্খিত নয় তা থেকে চেষ্টা করেও সরে যাওয়া সম্ভব নয়। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা নিয়ে জীবনে ফিরে আসতে হয়। উপন্যাসে বড় হয়ে উঠেছে "মানুষের নিঃসঙ্গ অসম্পৃক্ত, বিবিক্ত হয়ে যাওয়ার কথা।" যন্ত্রণায় পথ হারিয়ে যাবার কথা। হৈমন্তী পৃথিবীর কৃত্রিম পঙ্গু সমাজটার কাছ থেকে

পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু হয় না। শূন্যতার পৃথিবীটা আবার গ্রাস করে ফেলে তাকে, বিপ্লবী কৃশাণু মারা গেলে তার প্রত্যাশারও অপমৃত্যু ঘটে। নিঃসঙ্গ, একাকী হৈমন্তী বিবিক্ত হয়ে যায়।

'হলংমানসাই উপকথা' সেই অরণ্য জীবনের কথা ছোট হতে হতে যা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বনের নিবিড়তা এখন আর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, ঘন অন্তরাল এখন লজ্জা নিবারণ করতে সমর্থ হয়না। বনের হিংস্রতা ছাপিয়ে মানুষের হিংস্রতা আরও প্রকট। সব বনই এখন কারো না কারো দখলে। লেদু মিঞা যে কিনা আসলে সমু, সমসের নাকি সমরেন, প্রাণপণ চেষ্টাতেও লেদু মিঞা থাকতে পারলো না। পরিবর্তনের মহামন্ত্রে একদিন যাদের দীক্ষা হয়েছিল সেই বিশ্বাসের পৃথিবীটা হারিয়ে আজ সে ক্লান্ত, অনুতাপ কিংবা ভুল পথে দীর্ঘদিন চলার ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছে। গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে পৃথিবীর কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল, সে আশ্রয় হয়তো বা চান্দনি। বিশ্বাসের পৃথিবীটা কারো মধ্যে বেঁচে থাকুক এতো প্রতিটি বিচ্ছিন্ন মানুষের বিশ্বাস। তারপর একদিন লেদু মিঞাকে গুলি খেয়ে মরতে হলো, অরণ্যের সাথে সাথে বাঘেরও যেমন শেষ আশ্রয় নষ্ট হয়ে যায়, এই সমাজে লেদু মিঞারাও তেমনি আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে। 'শেষ থাকিবার স্থান' না পেয়ে শূন্যতার মধ্যে, অন্ধকার নরকের মধ্যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়। যারা বাস্তু হারিয়ে উদ্বাস্তু, মানবিকতাবোধ হারিয়ে নিঃসঙ্গ।

সূত্র নির্দেশ

১। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ১৮০।

২। তদেব, পৃঃ ১৩৫।

৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার, গড়শ্রীখণ্ড, দে'জ, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ৩৯৭।

৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, দুখিয়ার কুঠি, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৮।

৫। জীবনানন্দ দাশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৫।

৬। Prafulla Kumar Chakraborty, The Merginal Man, 1990, P-208.

৭। P.K. Bose (Edited), Refugees in West Bengal, 2002, P-203.

চতুর্থ অধ্যায়

অমিয়ভূষণের ছোটগল্পে উদ্বাস্তু জীবন

অমিয়ভূষণ মজুমদার নৈরাশ্যবাদী লেখক নন, সাহিত্যে বাস্তবতার শর্তকে ধারণ করে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের নানা স্তর ও মাত্রাকে সাহিত্যকৃতিতে সম্যকভাবে চিত্রিত করেছেন তিনি। তাতে সজ্ঞাত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন আশার বিস্তৃত সবুজ সুন্দর এক জগৎ। তাই তার সৃষ্ট উদ্বাস্তু জীবন, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতার জগতের চিত্রায়ণের পাশাপাশি অস্তিমগ্নের জগতটাও আমাদের সামগ্রিক আকর্ষণ করে। একথা শুধু অমিয়ভূষণের উপন্যাস সম্পর্কে সত্য নয়, ছোট গল্প সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন ---- 'উরুন্ডী' গল্পের পুলিন যখন শোভা মাসিকে বলে ---- "ফারাও ছিল মিশরের রাজা। তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একদল লোক বেরিয়ে পড়েছিল পিতৃভূমির খোঁজে, তাকে এক্সোডাস বলা হয়ে থাকে।" [১] তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না দলটা উদ্বাস্তু, নিঃসঙ্গ। তাদের জীবনে বঞ্চনার শেষ নেই, তবু তারা সার্থকতার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসার সন্ধানে. গল্পের পুলিনেরা হাঁস হয়ে উড়ে এসেছিল ওপারের পৃথিবী থেকে ভেঙেচুরে, ছিঁড়ে খুঁড়ে নতুন কিছু করা যায় কিনা, এই প্রত্যাশায় তারা উরুন্ডীতেই পাখা গুটিয়ে বসে পড়ে। বাহান্নজনের দলে এখন বাইশজন আছে, এক কল্পিত পিতৃভূমির সন্ধান করছে তারা। ময়লা কাপড়, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে পুরুষেরা এবং চুলে জটা আর গায়ের গন্ধ নিয়ে মেয়েরাও চলছে উরুন্ডীতে বাসা বাঁধার জন্য। অবশ্য সারা পৃথিবীতেই তখন আগুন জ্বলছিল। তবুও উদ্বাস্তু দলটি থামেনি কেননা তারা জানে বহির্গমনে বেরিয়ে আশ্রয়হীন থাকা সম্ভব নয়। ক্রমাগত চলার যে মন্ত্র বা শক্তি উদ্বাস্তু দলটিকে তা দিয়েছে শোভা মাসি। শরীরের ক্লান্তি আর মলিনতা নিয়ে উদ্বাস্তু এই দলটি যখন বিপর্যস্ত তখন তাদের দলনেতা পুলিনকে সাহস, ক্লান্তি ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে চলার শক্তি সঞ্চার করে দিতে নিজের শরীরের পৃথিবীটা পুলিনকে অধিকার করতে দিয়েছে এই শোভা। সেখানে আশ্রয় পেয়ে পুলিন ও তার অধীন সমস্ত দলটাই নিজের পায়ের ঘাম মাটিতে ফেলে স্থিতধী হবার প্রয়াস পেয়েছে, পেতে চেয়েছে জীবনের স্থায়ী ঠিকানার সন্ধান। যার মর্মমূলে রয়েছে একদিকে বাইশজন উদ্বাস্তু মানুষ অন্যদিকে শোভার নারী সত্তা। উভয়দিকেই আছে জীবনবোধের এক অনন্য তৃষ্ণা কিংবা বলা যায় নতুন জীবন সঞ্চারের আর এক প্রয়াস।

'অ্যাভলনের সরাই', যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের বাস্তুহারা এমন একদল মানুষের গল্প যারা অস্থির হয়ে দীর্ঘকাল পথ অতিক্রম করে শান্তির দ্বীপে পুনর্বাসন পেতে চায়। এই দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখিয়ে আনে সেন্ট সাইমন, কিন্তু বাস্তুহারা মানুষগুলির জীবনে হঠাৎ করে একদিন বঞ্চনার কালো মেঘ ভরাট হয়ে এসেছিল, পথ চলতে চলতে তাদের থেমে যাওয়াও ছিল স্বাভাবিক। তখন ক্লান্ত, পথহারা সেই দলপতিকে ভরসা

এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চার করেছে আর একটি নিঃসঙ্গ ক্লান্ত জীবন নিনা। দুটি জীবনের বলা চলে শরীরের সংঘর্ষে যে আলো জ্বলে উঠেছে সেই আলোই তো বাস্তুহারা দলটি অন্ধকার মাড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়াকে ডিঙ্গিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে, কেননা তাদের তো আরো অনেক পথ যেতে হবে। যা কঠিন দুর্গম। কিন্তু সবই সম্ভব প্রাণশক্তির প্রেরণায়। তবু বীভৎস, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বাস্তুহারা দলটি চলছে, 'অ্যাভলনের সরাই'-এর উদ্দেশ্যে। কেননা সেখানে পড়ে রয়েছে তাদের সমস্ত স্বপ্ন, নিশ্চিন্তি, খাদ্য বা নিরাপত্তা। কিন্তু কার্যত তারা কেউই শেষ পর্যন্ত অ্যাভলনের সরাইতে পৌছাতে সমর্থ হয়নি। হয়তো সম্ভবও ছিলনা, আসলে স্বপ্নের কাঙ্খিত লোকে পৌছানো যায় না। যুদ্ধ হোক বা না হোক মনের দিক থেকে আমরা সকলেই উদ্বাস্তু, নিঃসঙ্গ। আমাদের স্বপ্নের ভুবন থেকে আমরা উৎখাত হয়ে এক শান্তি স্থিতির দিকে চির অভিযাত্রী। পা ক্ষত-বিক্ষত; রক্তাক্ত হচ্ছে, মন বিষণ্ণ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে তবু আমাদের হাঁটার শেষ নেই। আর গল্পের নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু দলটি পথ চলতে চলতে সবশেষে যখন মুখোশের অন্তরালে শূন্যতার কঙ্কালের মুখোমুখি হয় তখন এই শূন্যতাকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। মূলহীন নিরাশ্রিত জনের আশ্রয় তৃষ্ণার পরিণতি হয়তো বা মৃত্যু কিংবা জীবনের সারাংশের বদলে নীরস একটা কাঠামো মাত্র।

অন্যদিকে 'সাদা মাকড়সা' গল্পে নামগোত্রহীন অনস্তিত্বের পরতে নেমে যাওয়া ব্যালেন্টাইন চরিত্রেও নিঃসঙ্গতার ছায়া। পিতৃভূমি থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মানুষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে বারবার স্বপ্ন দেখে সেখানে ফিরে যাবার, শান্তির স্বর্গে অন্তর তৃপ্ত করে নেবে বলে, অথচ যখন সেখানে কোনদিন পৌছানো গেল দেখা গেলে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।" এটাতো জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু মানুষের খোঁজা শেষ হয় না। তার চলার ধারা একখাত থেকে অন্য খাতে বয়ে যায়। এভাবেই বয়ে চলে আধুনিক মানুষের নিয়তি। টেম্মা যখন বলে ----- "এজীবনটা আমাদের স্যুট করছে না।" তখন সেই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা আমাদের স্পর্শ করে, নিঃসঙ্গতার ক্রমপ্রসারণ ও পরবাসবোধ আমাদের শিহরিত করে। 'ওগো মুগ্ধা' গল্পে গায়ত্রীর যখন মনে হয়, সে একটা নিঃসঙ্গ কূপে শুয়ে আছে অথচ স্বামী-পুত্র নিয়ে তার সুখের জীবন যাপন তখন জীবনানন্দের কবিতার মত কি এক বোধ জেগে উঠে যা গায়ত্রীকে নিঃসঙ্গ শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

এছাড়া 'মামকাঃ' গল্পে সুপর্ণ ছিন্নমূল হৃতসর্বস্ব মানুষের ভাবভঙ্গি আচার আচরণ হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করেও সর্বক্ষণ লেদু মিঞার হয়ে থাকতে পারে না। 'মৃন্ময়ী অপেরা'-র লেদু মিঞা সুপর্ণ হয়ে বাঁচতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছিধর জীবনের অতীতের অন্ধকারে থাকতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে ব্যর্থ তিব্বতী দম্পতির জনজীবন যখন হান আগ্রাসনের শোষণে ব্যর্থ হয়ে যায় তখনও সেই একই বয়ান, শূন্যতার আবির্ভাব। 'তাঁতী বউ' গল্পে তাঁতীর সুবল সুন্দর সন্তান ছাড়া জীবনে আর কিছুই স্বপ্ন নেই। সেই

স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাঁতী গৃহত্যাগী হয়ে যায়। সংসার উদ্বাস্তু, নিঃসঙ্গ তাঁতীকে আবার ফিরে আসতে হয় বাঁদী তাঁতী বউয়ের কাছে স্বস্তি পাবার জন্য। আর তাঁতী বউয়ের অসীম ক্লান্তি, ফকিরের মন্ত্র শোনা, জমিদার বাড়িতে জমিদারের সংস্পর্শ লাভও এক ধরনের নিঃসঙ্গ জীবনের চলা। 'দুলারহিনদের উপকথা'য় ভুখনও দুলারহিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে যখন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেউ কারো কাছে কোনোদিন পৌঁছতে পারে না, নিঃসঙ্গ এই জীবনে অন্ধকার আকাশের তারারা একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপন্নতায় নিমগ্ন চরিত্র দুটি জীবনের মূল থেকে, বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে কোথাও সরে গিয়ে আমাদের মনকেও বেদনার্ত করে তোলে, যদিও তাদের জীবনে তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই।

তবে একথা সত্য যে 'গড়শ্রীখণ্ড' কাহিনি সমাপ্তি পর্বে আলেফ শেখ বালি খুঁড়ে খুঁড়ে যখন শূন্যতা প্রতিরোধী নব কোন সম্ভাবনার উদ্ভাসন আবিষ্কৃত হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্ন বৃত্তে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চায় তখন জীবনে হার মেনে না নেবার লক্ষণটি প্রকট হয়ে ওঠে। পদ্ম আকৃষ্ট মুঙলাকে রক্ষা করার জন্য রামচন্দ্র পদ্মকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়ে এই শূন্যতা প্রতিরোধ এক ধরনের চেষ্টা করেছিল। 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও স্বপ্নকাঙ্খিত পদাতিকদের পদযাত্রা হয়ে যায় অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসার অক্লান্ত পদচারণা। 'উরুন্ডী' গল্পে কল্পিত কোনো পিতৃভূমি প্রকাশিত না হলেও 'কেউ একজন উঠে দাঁড়ায়' এমন সম্ভাবনায় দৃপ্ত। 'ওগো মুগ্ধা'-র গায়ত্রী অন্ধকারের নিঃসঙ্গতায় ডুবে থেকেও দেখতে পেয়েছিল রেল লাইনের পাশে ফুটে ওঠা ঘাসফুল, 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় আসফাক ব্যর্থ হলেও, গহীন অরণ্যে আদিম গুহামানবের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে 'আঁ-আঁ-ড়' গর্জনে ডুবে যায়। 'বিনদনি'-র জনাদন কৌম সত্তায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। 'দুখিয়ার কুঠি'-র মাতালুর বিশ্বাস ছিল মালতীর গর্ভে তার 'ছাওয়া' রয়েছে। 'হলং মানসাই উপকথা'-য় হলং নাগা চন্দানির পদপ্রান্তে নবজীবনের সম্ভাবনার বীজকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উপহারের মতো জমা দেয়। এইসব উদ্বাস্তুদের নিঃসঙ্গ জীবনের সর্বপ্রতিরোধই আগামী জাতকের উপহার।

পরিশেষে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব যে অমিয়ভূষণের অধিকাংশ লেখাতেই আধুনিক মানব সত্তার এই উন্মূলিত চেতনার একই রকমের অনুবর্তনের প্রাধান্য থাকে, এ সম্পর্কে গ্যাব্রিয়েল জোসিপোভিসির মন্তব্য নিম্নরূপ ---- "Perhaps every significant artist has only one theme, on which he performs endless variation. All Dostoevsky's novels, proust said could be called crime and punishment all Flaubert's L. Education sentimental, all Kundera's novels could be called life is elsewhere।" [১] কখনো মানুষ দুর্ভিক্ষে বা যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে সমাজ সংসার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ হারিয়ে, গৃহ হারিয়ে, শারীরিক ও মানসিক এই দুই দিক থেকে উদ্বাস্তু বা

নির্বাসিত হয়েছে। কখনো শক্তিশালীর অধিকার মত্ততায় মানুষ তার নিজস্ব ভূ-খণ্ড অথবা নিজের নারীকে হারিয়েছে, কখনো দেশ বিভাগের মতো ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক অপসিদ্ধান্তের ফলে অজস্র মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় নতুন করে আশ্রয় এবং নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ নিজস্ব ভূখণ্ড খুঁজে বেড়িয়েছে।

অমিয়ভূষণ এইভাবে নানারকম মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়াকে রূপায়িত করেছেন। এই থিম্-এর পৌনঃপুনিকতার ফলে আমাদের এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় যে উদ্বাস্তু ও নিঃসঙ্গ হওয়ার সমস্যাটি অমিয়ভূষণের রচনায় 'ঘটনার স্তর থেকে প্রতীকী স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।' তিনি দেখাতে চেয়েছেন নির্বাসিত হওয়া উদ্বাস্তু হওয়া নিঃসঙ্গতা আধুনিক মানুষের নিয়তি। গৃহহীন-দেশহীন-সমাজহীন এবং চিরন্তন মূল্যবোধ বর্জিত হওয়াই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আধুনিক মানুষের অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য। ফরাসী কবিরা যার নাম দিয়েছেন ---- 'Jean Sans Terre' অর্থাৎ John Landless। যা অমিভূষণের সাহিত্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে বারেবারে উপস্থিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১। অমিভূষণ মজুমদার, শ্রেষ্ঠগল্প, দেজ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৮০।

২। Gabriel Josipovice, Literature Criticism, TLS, 1988, P-695.

উপসংহার

উদ্বাস্তু ঃ অমিয়ভূষণ

আমরা বাঙালিরা অনেকে ভুলতে পারিনি দেশভাগের অমানুষিকতার কথা, ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট কিলিং'-এর দুঃস্বপ্নের কথা। সেদিন আমাদের বাঙালির চিরকালীন মিলন ঐতিহ্য দ্বিজাতিত্বে এক বিরাট সংকট চাপিয়ে দিয়েছে। তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে কুটিল রাজনৈতিক স্বার্থ-সংঘর্ষ, লোভ আর লালসার বিস্তার। ধর্মীয় বিদ্বেষকে ভিত্তি করে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল তাকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পেছন থেকে উৎসাহ দিয়ে ধ্বংসের নরযজ্ঞে পরিণত করেছে। যার ফলে বাঙালির ঐতিহ্যই শুধু নয়, দেশবোধ আর মাটির টানও কেমন যেন আলগা হয়ে গেল। মানুষ চিরাচরিত অভ্যাস আর জীবনের শিকড় হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে, নিরাশ্রয় হয়ে, বিশ্বাসের ভাঙনে 'উদ্বাস্তু' হতে বাধ্য হয়েছে।

লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার ইতিহাসের এই পালাবদলের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পাবনা জেলার গ্রামের সুখ শান্তির নীড় থেকে ছেলেবেলাতেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল আধুনিক সংস্কৃতির পরিচয় নেবার জন্য। পরবর্তীতে গ্রাম থেকে তাদের পুরো পরিবারটি বাস্তুহারা হয়ে এসেছিল কোচবিহার শহরে। এই গ্লানি তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনেই যেন বারে বারে ভিন্ন ভিন্ন রূপেও চরিত্রে ফুটে উঠেছে। তাই অমিয়ভূষণের অনেক লেখাতেই ঘুরে ফিরে আসে উদ্বাস্তু মানুষের মুখ, তাদের জয় পরাজয়ের ছবি। ফলে নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অবহেলিত মানুষের দল, যাদের জীবনে রয়েছে শুধু ক্লেদ, লেখকের সযত্ন সৃষ্টি যেন তাদের বাঁচার দলিল। ঘরহারা মানুষ বারেবারেই ফিরে পেতে চেয়েছে তাদের নিজস্ব বাসভূমি, যেখানে এক নিশ্চিন্ত পরিমণ্ডলে তারা আবার ফিরে পারে তাদের স্বাধীন গেরস্থালী, নিজস্ব চিত্তবৃত্তি। মাটির এক দুর্নিবার আকর্ষণে তারা বরণ করে নিয়েছে হাজারো দুঃখ কষ্ট, পথচলার নিদারুণ যন্ত্রণা। মরুভূমির ধূসর বালুকাবেলায়, গহন অরণ্যের গহীনতায়, শহরের ইটকাঠের মধ্যে যে পথচলা তা কখনো সফলতা পেয়েছে আবার কখনো পায়নি, বরং রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের ভেতরে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবু পথচলা থামেনি। তবে শুধু বাসভূমির ক্ষেত্রে নয় এর দোলা লেগেছে মানুষের মননধর্মেও। এক্ষেত্রে বলার কথা যে, নিজস্ব বিশ্বাসের সুস্থিত ভূমিটি বিচ্যুতি হলে সেওতো এক ধরনের উদ্বাস্তু জীবন। সেখানে ফেরার জন্য তখন মানুষের সাধনা শুরু হয়। এই সাধনারএ অন্য নাম হলো আধুনিকতা। কেননা নিঃসঙ্গ মানুষের উৎকণ্ঠা, উৎক্ষেপ ও বেদনা, নিঃসঙ্গ মানুষের চক্রাকার আত্মপরিক্রমা, বিচ্ছিন্নের যথার্থ বিচ্ছিন্নের গোলক ধাঁধায় ঘেরা, যা বিংশ শতকীয় আধুনিকতার প্রধান এবং বিশিষ্ট একটি ধারা।

বাস্তুহীন মানুষের এই পথচলা যুগে যুগে নদীর স্রোতের মতো। মানুষ যদি তীব্র আত্মবিশ্বাস

নিয়ে পথ চলে তবে প্রকৃতিও একদিন তার অঢেল দানে মানুষকে ভরিয়ে তোলে। বাস্তু উৎখাত মানুষ সেদিন ফিরে পায় তার সার্থকতা। হোকনা অন্যরকম, অন্য স্বাদমাখা, তবু জীবনের অন্য নামও যে জীবন। সেই জীবনের আলেখ্যে দেশবিভাগের আঘাতে পদ্মানদীর ধারের পাবনা জেলার চিকন্দি, বুধেডাঙ্গা, চরণকাশি, মানিকদিয়ার গ্রাম আর বন্দর দিঘাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মানব জীবনের অভিঘাত তথা সময়ের ভাঙাগড়ার তীরে মানুষ সমষ্টিগতভাবে বাঁচার যে চেষ্টা করে, তারই শিল্পরূপ অমিয়ভূষণের 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাস। আবার 'নিবাস' উপন্যাসে দেশবিভাগের করাল গ্রাস থেকে আত্মরক্ষায় রেল স্টেশনে হাজার হাজার লোক। ভিটেমাটি উৎখাত হয়ে এক সরল চক্রান্তের অসহায় শিকার সবাই। ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, কালিপড়া হাঁড়ি, দড়ি দিয়ে বাঁধা জড়ানো ময়লা মাদুর-কাঁথা। করুণ, রুগ্ন, অভুক্ত, অস্নাত, হাজার লোকের পূতিগন্ধ। যাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত স্কুলমাস্টার ভুবন ও স্ত্রী বিমি এবং মরণচাঁদ, সোদামুনি, শ্রীকান্ত -- এদের আশ্রয় হয়েছিল হলুদমোহন ক্যাম্পে। পরবর্তীতে এই ক্যাম্পের সবাইকে যেতে হল দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন হবে বলে। অর্থাৎ হলুদমোহন ক্যাম্পে যেসব মানুষ ছিন্নমূল হয়ে, সুস্থ জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছিল তারা আবার 'উদ্বাস্তু' হলো। মোটকথা বিমি, ভুবনবাবু, মরণচাঁদ, সোদামুনিদের মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ স্বস্থানচ্যুত হওয়াটাই উপন্যাসের মূলকথা।

আবার একথাও সত্য যে আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াই রক্তমাংসের জীবনের উষ্ণ স্বাদ পেতে চায়। উন্মূলিত মানব সমাজ অধিকারভোগী নিষ্ঠুর আধিপত্যের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে পড়ার গর্জন তোলে। শোষকের চাপে পড়ে যে সুকুমার প্রবৃত্তি ভাঙতে শুরু করেছিল আত্মশক্তি দিয়ে মানুষ তার উর্ধ্বে উঠে জয়গান গাওয়ার চেষ্টা করে। ফলাফল যাই হোকনা কেন এই যে আত্মোপলব্ধি, মিথ্যা রহস্যময়তাকে সরিয়ে দুচোখে মেলে দেখবার চেষ্টা এওতো এক ধরনের ফিরে আসা। নিরাশ্রিত জনমণ্ডলীর এমনই এক আশ্রয় উপলব্ধির কথা 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাস। এছাড়াও সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে নেমে আসে কৌমজীবনের সংকট, ভূমি-বিনষ্টি, শষ্য-বিনষ্টি, সংস্কৃতি বিনষ্টি। যার ফল জীবনকে করে তোলে বেদনার্ত। পথ ছেড়ে দিতে হয় সভ্যতার প্রতীক নিষ্ঠুর কালো পিচ রাস্তার জন্য। যা কিনা সর্বনাশী নগরায়ণের পথে তাদের টেনে নিয়ে যায়। তবু দ্রোহ জাগে। কৌমজীবন প্রতিবাদমুখর হতে চায়। 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে মানুষের এই বিশ্বাস খোঁজার সাধনা লক্ষ্য করা যায়। যদিও সে সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। তবুও ব্রাত্যজনের এই পথচলার আকল্প উদ্বাস্তু মননের স্বাক্ষর। আবার রাভা সমাজের কৌমজীবনকে অঙ্গে ধারণ করে 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসটির বিন্যাস। যে কৌমজীবনে বিশ্বাসের, সংস্কারের, ভূমিজ অধিকারের ও সংস্কৃতির সংকট যন্ত্র আগ্রাসনও উপনিবেশোত্তর জীবনবোধের চাপে জমি হারিয়ে, স্ত্রী হারিয়ে, স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যা উদ্বাস্তু জীবনেরই নামান্তর।

অন্যদিকে অমিয়ভূষণের ছোট গল্পগুলির দিকে যদি তাকাই তা হলে ঠিক একই ছবি। 'উরুন্ডী' গল্পে বাহান্নজনের যে দলটা একদিন তাদের 'ওই পৃথিবী' থেকে 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে পথ হাটা শুরু করেছিল সে দলে লোকসংখ্যা এখন মাত্র বাইশ। এই বাইশজনকে বাধার রক্তচক্ষু, অত্যাচারের তাণ্ডব যন্ত্র ণা, কিছুই আটকাতে পারেনি। গোপীদের পরিবারটা রেল স্টেশনে বসে পড়ে, মরণচাঁদ আর বিমলির সাথে কয়েকজন পিছিয়ে পড়ে দলছাড়া হল। হিরণ, যোগেশ ও সরলা মাসির মৃত্যু হল। তবুও বাইশজন থামেনি। কেননা বাস্তুচ্যুত হয়ে বহির্গমনে বেরিয়ে আশ্রয়হীনদের থামা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত বাইশজন আশ্রয় পেল চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের কালো পিচের পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তার বরাবর পাঁচ সাতশো গজ, অন্য কোথাও ষাট সত্তর গজ পর্যন্ত যে জায়গার আয়তন তারই নাম 'উরুন্ডী'।

'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে দেখা যায় যুদ্ধ মানুষকে অসহায় করে তোলে। অস্থির উন্মনা মানুষ হ্যাভারস্যাকে সামান্য কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে জীবন মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যেই সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে যেতে চায় অন্য কোনখানে। যেখানে থাকবে একবুক ভালোবাসার আশ্রয়, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবার এক অলৌকিক ঘর গেরস্থালী, স্বপ্নে কিংবা দৃঢ় বিশ্বাসে যার নাম 'অ্যাভলনের সরাই'। 'সাদা মাকড়সা' গল্পেও একই উদ্বাস্তু সত্তার হাহাকার। পিতৃভূমি থেকে উৎখাত মানুষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে বারবার স্বপ্ন দেখে সেখানে ফিরে যাবার। শান্তির স্বর্গে অন্তর তৃপ্ত করবার। অথচ যখন সেখানে কোন দিন বা পৌঁছানো গেল --- দেখা গেল হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে। এটাইতো জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু মানুষের খোঁজা শেষ হয়না। তার চলার ধারা একখাত থেকে অন্যখাতে বয়ে যায়। এভাবেই বয়ে চলে আধুনিক মানুষের নিয়তি।

পরিশেষে বলার কথা যে, মহৎ সাহিত্যিক তার সৃষ্টির ভেতরে রস রূপের সাথে মিশিয়ে দেন জীবনযাপনের ধরণ, শ্রেণি সংক্রান্ত নানা সমস্যা এবং সমাজের নানা সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। অন্যদিকে রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণি সংগ্রামের যে ঘটনাটি সংঘঠিত হয় তার ফলে সমাজের বুনিয়াদ যেমন তেমনি ব্যক্তির মননেরও বুনিয়াদ পরিবর্তিত হয়। এই বক্তব্যই যখন কোনো সার্থক শিল্পীর লেখনীতে কায়ারূপ ধারণ করে তখন সেই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত না বলে উপায় নেই। কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ এই গোত্রেরই একজন প্রথম সারির কথাকার।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা

(ক) উপন্যাস ঃ—

(১) নীল ভুঁইয়া --- রচনাকাল ঃ আগস্ট-অক্টোবর-১৯৫৩, প্রথম প্রকাশ ঃ চতুরঙ্গ পত্রিকা, গ্রন্থাকারে প্রকাশ জানুয়ারি-১৯৯৫, প্রকাশন ঃ নাভানা। উৎসর্গ- আমার সব গল্পের দিদিমা কালোদিকে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

নয়নতারা --- (নীলভুঁইয়া-র পরিবর্তিত সংস্করণ) প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৬৬, প্রকাশক ঃ ভারবি।

(২) গড়শ্রীখণ্ড --- প্রথম প্রকাশ ঃ পূর্বাশা পত্রিকা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ মার্চ-১৯৫৭, প্রকাশক নাভানা। উৎসর্গ ঃ আমার সবচাইতে পরিচিত পুরুষ চরিত্র বাবাকে উৎসর্গ করলাম।

(৩) দুখিয়ার কুঠি ---প্রথম প্রকাশ ঃ গণবার্তা পত্রিকা, শারদীয়-১৩৬৪। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল-১৯৫৯। প্রকাশকঃ নিওলিট পাবলিশার্স। উৎসর্গ ঃ আমার গল্পের আদি পাঠক আমার মাকে।

(৪) নির্বাস --- গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি-১৯৫৯। প্রকাশক ঃ নিওলিট পাবলিশার্স। উৎসর্গ ঃ অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দী চিরজীবিতেষু।

(৫) উদ্বাস্তু --- প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক-১৩৬৯। প্রকাশক ঃ ত্রয়ী প্রাকশনী। উৎসর্গ ঃ শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুহৃদবরেষু।

(৬) মহিষকুড়ার উপকথা --- প্রথম প্রকাশ ঃ শারদীয়, ঘরোয়া পত্রিকা-১৩৮৩। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই-১৯৮১, প্রকাশকঃ অন্বেষা। উৎসর্গ ঃ অম্লান, আনন্দ ও অপূর্ব-কে।

(৭) বিলাস বিনয় বন্দনা --- প্রথম প্রকাশ ঃ শারদীয়া ঘরোয়া পত্রিকা-১৩৮৩। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া-১৩৮৯, প্রকাশকঃ অন্বেষা। উৎসর্গ ঃ মীনাক্ষী, এথেনা ও এনাক্ষী-কে।

(৮) রাজনগর --- প্রথম প্রকাশ ঃ চতুরঙ্গ পত্রিকা, ১৩৭৯-৮১ ধারাবাহিকভাবে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ-১৩৯১, প্রকাশক ঃ অরুণা প্রকাশনী। উৎসর্গ ঃ শ্রীমান অপরূপজ্যোতি মজুমদার।

(৯) মধু সাধু খাঁ --- প্রথম প্রকাশ ঃ সারস্বত প্রকাশ, অগ্রহায়ণ-১৩৭৫, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি-১৯৮৮, প্রকাশক ঃ বাণী শিল্প। উৎসর্গ ঃ শ্রীমান সুখেন্দু চক্রবর্তী চিরজীবিতেষু।

(১০) ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর --- প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক-অগ্রহায়ণ-১৩৭৭, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ জানুয়ারি-১৯৮৮, প্রকাশক ঃ প্রতিভাস। উৎসর্গ ঃ আমার পুত্র অপূর্বজ্যোতিকে।

(১১) এই অরণ্য এই নদী এই দেশ --- প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ-১৩৯৫। প্রকাশক ঃ সাহিত্য সংস্থা। উৎসর্গঃ এথেনা মজুমদারকে দিলাম।

(১২) বিবিক্তা--- প্রথম প্রকাশ ঃ সমতট, বিশেষ সংখ্যা হিসেবে-১৯৭৮। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১২ ডিসেম্বর-১৯৮৯, প্রকাশক ঃ রক্তকরবী। উৎসর্গ ঃ অনুজ প্রতিম শ্রী বিকাশ বাগচিকে স্নেহ নিদর্শন।

(১৩) চাঁদবেনে --- প্রথম প্রকাশ ঃ চতুরঙ্গ ও বসুধারা পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ-১৪০০, প্রকাশক ঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। উৎসর্গ ঃ স্নেহভাজন নির্মাল্য আচার্যকে।

(১৪) বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী --- প্রথম প্রকাশ ঃ শারদীয় যুগান্তর ঃ ১৩৯১, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা-১৩৯১, প্রকাশকঃ রক্তকরবী। উৎসর্গ ঃ কন্যাসমা অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী-কে।

ছোটগল্প সংকলন ঃ-

(১) পঞ্চকন্যা --- গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর-১৯৬২। প্রকাশক ঃ নিউস্ক্রিপট, সংকলিত গল্প ঃ সে সাগ্নিকা, সাদা মাকড়সা, মধুছন্দার কয়েকদিন, দুলারহিন্দের উপকথা, ওগো মুগ্ধা। উৎসর্গ ঃ শ্রীযুক্ত বীণাপানি দেবী অশেষ শ্রদ্ধাস্পদেষু।

(২) দীপিতার ঘরে রাত্রি --- গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ এপ্রিল-১৯৬৫। প্রকাশক ঃ সিগনেট প্রেস, সংকলিত গল্প ঃ অঘটনা, দীপিতার ঘরে রাত্রি, প্রমীলার বিয়ে, কলঙ্ক, সুনীতি, পদ্মিনী, রানী ইন্দুমতি, ইতিহাস, শহিদ, গারদ, ভদ্রলোকের বাড়ি, ভূকম্পন, পলদহ, তাঁতীবউ। উৎসর্গ ঃ শ্রীমতী গৌরী দেবী মজুমদার করকমলেষু।

(৩) শ্রেষ্ঠ গল্প --- গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর-১৯৮৬। প্রকাশক ঃ বাণী শিল্প, সংকলিত গল্প ঃ তাঁতী বউ, দুলহারিনদের উপকথা, অ্যাভলনের সরাই, উরুণ্ডী, এপস এণ্ড পিকক্, সাইমিয়া ক্যাসিয়া, শ্রীলতার দ্বীপ, পায়রার খোপ, মৃন্ময়ী অপেরা, মামকাঃ। উৎসর্গ ঃ এরকম তোমার ইচ্ছায়। দেখতে কি পাও, শুনতে কি পাচ্ছ ? অপেক্ষা করো।

(৪) গল্প সমগ্র-১--- প্রথম প্রকাশ ঃ ১১ মাঘ-১৪০১। প্রকাশক ঃ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। সংকলিত গল্প ঃ দূরাভাষিত, হনিডলার্ক, গল্প, চার্জ, একটি দহের গল্প, অধ্যাপক মোহিত স্যারের উপাখ্যান, রিচুয়াল, রাজীব উপাখ্যান, নির্মল সিংঘের অপমৃত্যু, ম্যানইটার, অর্পিতা সেন, টাইগন-লিটিগন, একটি শিকারের কাহিনী, সুশোভনার কাহিনী, ডাউন কিউল প্যাসেঞ্জারে, একটি মাঝারি মানুষের গল্প, মিস্টার ফন্‌টি, অসমাপ্ত।

(৫) ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প --- প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা-২০০০, প্রকাশক ঃ অনুষ্টুপ, সংকলিত গল্প ঃ ম্যাকডাফ সাহেব, মৃন্ময়ী অপেরা, ততঃকিম, ততঃকিম, বেতাগ বাইতোড়, সুরসুনা প্রভৃতি, নেই কেন সেই পাখি, পায়রার খোপ, অমৃত্যুর সন্ধানে, মামকাঃ, অন্ধকার। উৎসর্গ ঃ অনির্বাণ জ্যোতি মজুমদার।

(৬) তন্দ্রসিদ্ধ --- প্রথম প্রকাশ ঃ শিলিগুড়ি বইমেলা-১৯৮৮। প্রকাশক ঃ বাক্‌শিল্পী, সংকলিত গল্প ঃ তন্দ্রসিদ্ধ, বেতাগ বাইতোড়, সুরসুনা প্রভৃতি, তুলাই পাঞ্জার বোয়া, অন্বেষণ।

(গ) প্রবন্ধ সংকলন ঃ-

(১) লিখনে কী ঘটে --- প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৬। প্রকাশক ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সংকলিত প্রবন্ধ ঃ লিখনে কী ঘটে, উপন্যাস সম্বন্ধে, উপন্যাসের গল্প, ঔপন্যাসিক ও জীবন দর্শন, সাহিত্য ও নীতি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব, সাহিত্যিক জীবন মহাশয়, সাহিত্যের ধারণা, সংবিত্তি, রমণীরত্নের সন্ধানে, পদ্মপুরাণ কথা। উৎসর্গ ঃ স্নেহাস্পদ কল্যাণ চৌধুরীকে।

(ঘ) রচনা সমগ্র ঃ-

(১) অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র-১ --- প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল-২০০২। প্রকাশক ঃ দেজ পাবলিশিং, এতে রয়েছে নিজের কথা (প্রবন্ধ) গড়শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) প্রমীলার বিয়ে, মধুছন্দার কয়েকদিন, নন্দরানী, তাঁতীবউ, সান্যালদের কাহিনী, ইতিহাস, গারদ, সুনীতি-র মতো গল্পগুলি এবং দা গড অন মাউন্ট সিনাই (নাটক) ও রচনা প্রসঙ্গ।

(২) অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র-২ --- প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি-২০০৩। প্রকাশক ঃ দেজ পাবলিশিং, এতে রয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদ (প্রবন্ধ), নয়নতারা ও রাজনগর (উপন্যাস), দীপিতার ঘরে রাত্রি, কলঙ্ক, দুলারহিনদের উপকথা, অঘটনা, শহিদ, সাগ্নিকা-র মতো (গল্প) এবং মহাসত্ব (নাটক) আর রচনা প্রসঙ্গ।

(ঙ) নাটক ঃ—

(১) দা গড অন মাউন্ট সিনাই --- প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র-১, এপ্রিল-২০০২, প্রকাশক ঃ দেজ পাবলিশিং।

(২) মহাসত্ব --- প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র-২, এপ্রিল-২০০৩, প্রকাশক ঃ দেজ পাবলিশিং।

(চ) **আত্মজীবনী বিষয়ক রচনা ঃ—**

(১) নিজের কথা --- প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঃ অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র-১, এপ্রিল-২০০২, প্রকাশক ঃ দেজ পাবলিশিং।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের অগ্রন্থিত রচনাপঞ্জি

(ক) **উপন্যাস ঃ–**

	নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
(১)	সুরাকসিন --	এষা (এই উপন্যাসটি ১৩৮০ সালে পরিবর্তিত আকারে নিউ ক্যালকাটা নামে 'ঘরোয়া' শারদীয় এবং পরে 'মাসিক ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে)।	১৯৬৬-৭০
(২)	দোম আত্তনিত্ত --	ঘরোয়া, শারদ সংখ্যা	১৩৭৯
(৩)	তাসিলার মেয়র --	বারোমাস ১৩৮০-৮২	
(৪)	মতি ঘোষ পার্ক, ভানুগুপ্তলেন --	ঘরোয়া, শারদ সংখ্যা	১৩৮১
(৫)	বিনদনি --	সপ্তাহ, শারদ সংখ্যা	১৩৯২
(৬)	উত্তরপুরুষ --	উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শারদ সংখ্যা	১৩৯৪
(৭)	মাকচক হরিণ --	দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা	১৩৯৮
(৮)	ট্রাজেডির সন্ধানে --	দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা	১৪০১
(৯)	অতিবিরল প্রজাতি --	দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা	২০০০
(১০)	রামী রজকিনী --	বোবাযুদ্ধ, শারদ সংখ্যা	২০০০

'তুলাই পাঞ্জাররোয়া' ও 'অমৃত্যুর' সন্ধানে সাময়িক পত্রে উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে 'পঞ্চকন্যা' ও 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে গল্প হিসাবে গ্রন্থিত হয়েছে।

(খ) ছোটগল্প ঃ-

	নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
(১)	অণঘমিত্রা --	কালান্তর/নতুন সাহিত্য	১৯৬২
(২)	অনির্বচনীয়	পূর্বাশা	১৯৬৪
(৩)	একমন্দ ভাগ্য বাস	কথাশিল্প	১৯৮৩
(৪)	একটি কুয়োর গল্প	লালনক্ষত্র	১৩৯৩
(৫)	একটি বিপ্লবের মৃত্যু	নতুন সাহিত্য/লালনক্ষত্র	১৩৯৫
(৬)	এবং এক মৃগ	অমৃত	১৯৭৭
(৭)	কালো কুয়োর রোমসাপ অথবা এক রিডার ফেওলি গল্প	শারদীয় দৈনিক বসুমতী	১৪০২
(৮)	চলিয়াছ	পরিচয়	১৯৮০
(৯)	ট্যাঁশ গল্প অথবা কর্ণ কুন্তীর সংবাদ	উত্তরাধিকার	২০০০
(১০)	নক্ষত্র যুদ্ধ, নন্দরানী	চতুরঙ্গ	১৩৫৩
(১১)	নীল আকাশ সবুজ পাহাড়	মনন	১৯৮৬
(১২)	প্রতিক্রিয়াশীল	জয়শ্রী/ব্যতিক্রম	১৪০২
(১৩)	বিস্মিতা	অমৃত	১৯৬৫
(১৪)	বৃত্তান্ত সাতেকরী	লাল নক্ষত্র	১৪০১
(১৫)	ভাইরাস	কবিতীর্থ	১৯৮৭
(১৬)	ভূখন	চতুরঙ্গ	১৩৫৯
(১৭)	রাংতার আলো	কালপুরুষ	১৯৮৭
(১৮)	সরসিজা, সহযাত্রী	সপ্তাহ	১৯৯১
(১৯)	স্বর্ণ সীতা	অমৃত	১৯৭৭
(২০)	উদ্বাস্তু	কবিতীর্থ/অমৃতলোক	১৯৮৬
(২১)	সাত একর	সপ্তাহ	১৩৯১
(২২)	অনেক বেবুন	উত্তরায়ণ	?
(২৩)	অন্তরীক্ষ	কৌরব	?
(২৪)	অবতংস	কালান্তর	?

(২৫)	অরণ্যের রোদন	দাবী	?
(২৬)	ইলেক্ট্রনিক্স	জয়শ্রী	?
(২৭)	উপন্যাস লেখা	পরিচয়	?
(২৮)	একটি খামারের গল্প	গণবার্তা	?
(২৯)	একটি গৃহত্যাগের গল্প	গণবার্তা	?
(৩০)	কমিউন	জয়শ্রী	?
(৩১)	চাটুজ্যে মজুন্দার	উত্তরবঙ্গ সংবাদ	?
(৩২)	দি ক্যাসল	দর্পণ	?
(৩৩)	নাথিং ডুইং	চতুরঙ্গ	?
(৩৪)	নীল কমল	বর্তমান	?
(৩৫)	প্রতীমা ও পুতুল	চতুরঙ্গ	?
(৩৬)	ক্রস লাইন	দর্পণ	?
(৩৭)	বক্স রুম	আজকাল	?
(৩৮)	বণিক লক্ষেশ্বর	পূর্বপত্র	?
(৩৯)	বিপ্লব	জয়শ্রী	?
(৪০)	ভটওলা	এক্ষণ	?
(৪১)	মেওয়া ও কিতাব সকল	চতুরঙ্গ	?
(৪২)	সুধীরবাবু	উত্তরবঙ্গ সংবাদ	?
(৪৩)	স্বর্গ ভট্ট	চতুরঙ্গ	?
(৪৪)	একটি মাঝারি মানুষের গল্প	গণবার্তা	?
(৪৫)	গঙ্গা হরিণ চিতা ইত্যাদি	সংবিত্তি	?
(৪৬)	চার্জ	চতুরঙ্গ	?
(৪৭)	নেই কেন সেই পাখি	?	?
(৪৮)	সহযাত্রী	?	?
(৪৯)	মাকচক	?	?

(গ) প্রবন্ধ ঃ—

	নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
(১)	আমার বাল্যের দুর্গোৎসব এবং উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য	দ্রোহ	১৯৮৩
(২)	উদ্বেল সেই দয়ার সাগরকে	উত্তরণ	১৯৭০
(৩)	কবিতার আধুনিকতা ও দুরূহতা বিষয়	অন্যস্বর	১৯৮৬
(৪)	কেন লিখি	লা পয়েজি	১৯৭৯
(৫)	খামখেয়ালি শহর	?	১৯৭৬
(৬)	জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি	রাহু/চতুরঙ্গ	?
(৭)	জার্নাল থেকে	নিষাদ	১৯৭০
(৮)	দৃশ্য কাব্য	স্মরণিকা (উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন)	?
(৯)	প্রসঙ্গ রাজনগর	উত্তরদেশ	১৯৮৭
(১০)	প্রাচীন কুচবিহারের ভাষা ও সংস্কৃতি	?	১৯৬৮
(১১)	বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য	উত্তরসূরি	?
(১২)	ভালো ফিল্ম	?	১৯৬১
(১৩)	রবীন্দ্র উৎসব	?	১৯৬১
(১৪)	লিটল ম্যাগাজিন ও আমি	কৌরব	১৯৮১
(১৫)	শরৎচন্দ্রের উপন্যাসঃ ত্রিশ বছর পর	উত্তরসূরি	১৩৭৪
(১৬)	শিল্পের আনন্দ	লা পয়েজি	১৯৮৬
(১৭)	শ্রীকান্তে কি ঘটে	কালপুরুষ	?
(১৮)	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	উত্তরসূরি	১৯৬৩
(১৯)	সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব	উত্তরসূরি	১৯৬৩
(২০)	সাহিত্যের অগ্রগতি	নতুন সাহিত্য	?
(২১)	সংস্কৃতি ও লোক সংস্কৃতি	জার্নাল অব ডুয়ার্স কাউন্সিল ফর সোসাল রিসার্চ	১৯৯১
(২২)	স্বপ্ন ভঙ্গ	উত্তরসূরি	১৯৭১
(২৩)	স্মাগলিং হোডিং প্রভৃতি	উত্তর সীমান্ত বঙ্গ	?

(ঘ) নাটক ঃ-

	নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
(১)	মধুবার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম	চতুরঙ্গ	১৩৬০
(২)	বিয়োগ	উত্তরায়ণ	?
(৩)	রাঙা দি	উত্তরায়ণ	?

(ঙ) আত্মজীবনী বিষয়ক রচনা ঃ-

(১)	আমার সম্বন্ধে	কৌরব	১৯৭৬
		উজ্জ্বল উদ্ধার	২০০১

(অমিভূষণ মজুমদারের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও উল্লেখিত সব লেখার প্রকাশক (পত্র পত্রিকার নাম) ও প্রকাশের তারিখ/সাল সংগ্রহ করতে না পারায় আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। ফলে যেসব রচনার প্রকাশকাল ও পত্র-পত্রিকার নাম সংগ্রহ করা যায়নি সেখানে (?) প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি।)

আমৃত্যু লিটল ম্যাগাজিনকে ভালোবেসে লিটল ম্যাগাজিনেই লিখে গিয়েছেন অমিয়ভূষণ। প্রকাশিত সেইসব লেখার অনেক লেখাই গ্রন্থিত হয়নি আজও। আবার অনেক লেখাই থেকে গেছে অপ্রকাশিত। আমার সীমিত সাধ্যে অমিয়ভূষণের গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত রচনার একটি পঞ্জি তৈরি করলাম। কিন্তু স্পষ্ট জানি, এ পঞ্জির বাইরেও রয়ে গেছে অমিয়ভূষণের আরও লেখা। সীমানার বাইরে রয়ে গেছে যে সমস্ত লেখা পরবর্তীতে সেইসব লেখার নাম, পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল জানার আগ্রহ রইল।

পরিশিষ্ট

কথা সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার পিতৃভূমি হিসেবে পূর্ববাংলার পাবনা-রাজশাহী অঞ্চল, জন্মভূমি হিসেবে উত্তরবঙ্গের জল, মাটি, আবহাওয়া, এবং কর্মসূত্রে পাবনা, রাজশাহী এবং উত্তরবঙ্গের অলিগলি, এই অঞ্চলের মানুষ, তাদের আচার ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভাষা বোধকে এমনভাবে আয়ত্ত করেছেন যে তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায় এর প্রভাব পড়েছে। ফলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের পটভূমি, এবং চরিত্ররা সাধারণত এইসব অঞ্চল থেকেই উঠে এসেছে। তাই তাদের মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব ভাষা। যে ভাষা অমিয়ভূষণের রক্তে প্রবাহিত, প্রবাহিত তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্পে। এইসব আঞ্চলিক ভাষা অমিয়ভূষণের সাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে হয়তো পাঠকই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য থেকে প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারেন না, এবং পারেন না বলেই দুরূহের পর্যায়ে ঠেলে দেন। সম্ভবত এইজন্য সমালোচকরা মনে করেন, অমিয়ভূষণের সাহিত্য পাঠে পাঠককে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয় বা পূর্ব দীক্ষিত হতে হয়, যার প্রধান কারণ অমিয়ভূষণের ব্যবহৃত ভাষা। যা আমি ব্যক্তিগতভাবেও অনুভব করেছি। ফলে অমিয়ভূষণের উপন্যাস, ছোটগল্পে ব্যবহৃত রাভা ভাষা, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষা এবং পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের উপভাষা। এবং এইসব উপভাষারই প্রচলিত কিছু শব্দের প্রকৃত বাংলা অর্থ বা শব্দ (ক), (খ), (গ) ক্রমানুসারে উল্লেখ করলাম।

(ক) রাভা ভাষা ঃ এভাষা সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং আসামে কোঁকড়াঝাড়, গোয়ালপাড়া এবং বঙ্গাইগাঁও অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, ‘বিনদনি’, ‘মাকচক হরিণ’ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃত রাভা শব্দ	প্রকৃত বাংলা শব্দ/অর্থ
আং	আমি
নৌং	তুমি
ননকইন	তোমার
আমায়	মা
আওয়া	বাবা
ইটি	মাসি
মনি	পিসি
বেটই	কাকা
আজং	ভাই

আনাও	বোন
আদা	দাদা
আয়রা	দিদি
মায়বেদ	ভাত
মায়রং	তাল
না	মাছ
ফাব	রুটি
মুইপেচাল	সবজি
তাতুং	কি
লেইতা	যাব/যাওয়া
সানিগা	খাব
লেইচা	যাবনা
সাচ্চা	খাবনা
কৌম্ব	কাজ
ফার	রাত/রাত্রি/অন্ধকার
সান	দিন
জৌক	বৌ
কেলাং	জামাই
ছিওউ	মৃত্যু
উতুংহসুক	গোত্র
বাতাংসা	পূজা
বায়তাংনিগা/বাঁয়	দেবতা/বন্ধু
হ্যা	জমি
বইনিগা	চাষ
মায়চারাং	ধান
হ্যা আকার	অনাবাদী জমি
মিচিক্	নারী
মি	পুরুষ

সাবিক	ছেলে
মিচিকসা	মেয়ে
নেমা	সুন্দর
মসু	গরু
লঙ্গন	লাঙ্গল
নকর	চাকর
উচু	ঠাকুরদা/দাদু
ওতই	দিদিমা/ঠাকুরমা
মন্ত্রর	মন্ত্র
মুসি	মহিষ/মোষ
পিস্বাক	লাল রং
বল্লাং	সাদা রং
পেন্নেক	কালো রং
কান	শরীর
নচর	কান
হলানি/হাইলদি	হলুদ
অতুংমুং	নাম
হুসুক	পদবি
নিংগো	তোমাকে
যোগসিত	ভালোবাসা
চেলপাক	জীবন
হা-সাম/মায়রীয়া	পৃথিবী
সং	গ্রাম
কৌম্বই	ফসল
রাংচিকা	বৃষ্টি
মৌক্লৌউ	পছন্দ
ঝড়	নদী
তালায়নাংতা	বদলে যাওয়া/পরিবর্তন

হানতেই	আলু
লুফুন	শাড়ি
কালাই	নেংটি
চেক	জাল
চকট	মদ
সানা	খাওয়া
যোকবকাওউ	তালাক
হাসা	আদর/প্রেম
সা	বাচ্চা
সা-গিনি	শিশু
বড়ুওউ	বৃদ্ধ
কইনচা	ঘৃণা
মাইচুকরব	পান্তা ভাত
চু	কুয়া
কলচিকা	নলকূপ
যোগোউ	ঘর
মারা পিদান	আত্মীয়
বচ্তেই	আম
কুচুংতেই	কাঁঠাল
লেন্তেই	কলা
পাড়ে	গায়ের মোড়ল
চায়	গান
বসিনি	নাচ
তংকু	তামাক
লৌংআ	ধরা
ল্যা	নেওয়া
ফই	ডাকা
আফা	আনা

চেইতা	দেখা
কিলাংনানি	বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম বা রীতি
চিকাবাইরাই	মানবীয় আত্মার প্রকৃত অধিষ্ঠান
লসংহা	উজ্জ্বল পাহাড়
রাইন্তুক	গৃহের শ্রীসম্পদের দেবী
লাইফুন	মেখলা জাতীয় পোষাক
কামুং	বক্ষ বন্ধনী পোষাক
নাইগৌ	বাড়ি
ঋীয়া	নেই
হাওড়ীয়া	ভূমিহীন
কোচানি	কোচ জাতি
গাবত্র	রং
রাক্রাংনি	আকাশ
হিজিলিং	নীল
সেরফাং	শাল
কাম্রাং	বংশ

(খ) রাজবংশী উপভাষা ঃ ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা একই। উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এই ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কোচবিহার অঞ্চলে সর্বাধিক, অমিয়ভূষণ মজুমদার যেহেতু কোচবিহার থেকেই উত্তরবঙ্গকে দেখেছেন, চিনেছেন, ভালোবেসেছেন, বেছে নিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের পটভূমি হিসেবে। ফলে এই অঞ্চলের ভাষা সেখানে আবশ্যিক। অমিয়ভূষণ এর ব্যতিক্রম নন বলেই রাজবংশী ভাষা তাঁর সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। 'দুখিয়ার কুঠি', 'মহিষকুড়ার উপকথা' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃত রাজবংশী শব্দ	প্রকৃত বাংলা শব্দ/অর্থ
মুই	আমি
কঙে/কইম/কইছে	বলা/বলবো/বলেছে
ভাবলং	ভাবছি/ভেবেছি

তোমাক	তোমাকে/তুমি
ধরি/সাথত	সঙ্গে/সাথে
যাং	যাব
এলায়/এলা	এখন
কাঁয়	কে
হেঁউতির চায	আমন ধানের চায
আগুই	আগে
মানত	মনে/মন
যেদু	যতক্ষণ
পাং	পারা
অও	বেশি
দেমাক/দ্যামাক	মেজাজ
খ্যামতা	ক্ষমতা/সাহস
হলং	হওয়া
জানং	জানা
চোখু	চোখ
আগৎ	সামনে
গেইছে	চলে যাওয়া/চলে গেছে
ফিন/ফির	আবার
যাঙ	যাবে/যাওয়া
লাম্বা	লম্বা
অলপ	অল্প/কম
গোম্ফ	গোফ
রামক্	রামকে
গছৎ	গাছ/গাছে
দিবার/দেং	দিতে/দিচ্ছি
কং/কঙ্গে	বলা/কওয়া
দেং/দিম	দিব/দেওয়া

ধরছং/ধরং	ধরা/ধরবো
গেইছং	গিয়েছি
দিছং/দিছঙ	দিয়েছি
গিছলু	গিয়েছিলে
গিছনু	গিয়েছিলাম
গেইল	গিয়েছিল
যাইম	যাবো
যাবু	যাবি
দেখং/দ্যাখং	দেখি/দেখা
এলা/এলায়	এখন
যেলা	যখন
যেটে	যেখানে/যেথায়
ত্যা	তো
ত্যাও	তবু
কোটে	কোথায়
গায়ৎ	শরীর/গা
ভাটিয়া	যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে
কইলং	বললাম
পুছিলেক	জিজ্ঞাস করা
পাছৎ	পরে
হ্যাটর ম্যাটর	এদিক সেদিক/ঝুট ঝামেলা
ডাঙর	বড়
কাঁয়	কে
মানসি	মানুষ/লোক
ভাইওক	ভাইকে
কাম	কাজ
ইগুলা	এগুলি
ব্যায়া	খারাপ/নোংরা

বেটি/মাদী	মেয়ে মানুষ
বেটা/মর্দা	পুরুষ মানুষ
ছাওয়া	শিশু/বাচ্চা
যাইম	যাবো/যাব
রাখছুং	রাখা/রেখেছি
আইসলং	এসেছি
নেঙ	নিব
সাঝৎ/সাঁঝ	সন্ধ্যা
দুখ	দুঃখ/বেদনা
হামার	আমাদের
নিচৎ	নিচে/তলায়
বাপক	বাবাকে
কোটে গেইল	কোথায় গেল
মোর	আমার
আইসং/আসলং	আসা/আসছি
রইস	একটু অপেক্ষা করা
যাউক কেনে	যেতে দাও
উমার	ওদের/তাদের
ইয়াৎ/এইটে	এখানে
খাবা/খাবু/খাং	খাবে/খাব
আইৎ/রাইতত	রাত্র/রাত্রি
ভাবং	ভাবা/চিন্তা করা
আজী	আজ/আজকে
শুনিম	শুনবো
দুসরা	অন্যান্য
বেচিম	বিক্রি করবো
পিধান	প্রধান/শ্রেষ্ঠ
কইছে	বলছে/বলেছে

শুতি গেইছং	শুইতে যাওয়া
সিয়ান	পূর্ণ বয়স্ক
সিয়ানা	চালাক
বইসেক	বস/বসা
ইয়ার	ওর
কাঁউ	কেউ
অক্ত	রক্ত
মাওরিয়া ছাওয়া	জন্মের পরে যে সন্তানের মা বা বাবা মরে গেছে
তামান	সমস্ত
মাইঝলা	মধ্যম
ভুঁই	জমি
যেদু	যদি
ভাল/ভালে	ভালো
আরউ	আরো
টেমি	কৌটা/এক ধরনের ছোট পাত্র
তামাম	খুব/বেশি

(গ) পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের উপভাষাঃ এই উপভাষাকে ভাষাবিদরা বরেন্দ্রী উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ পূর্ব বাংলার পাবনা-রাজশাহী অঞ্চল নিয়ে এর বিস্তৃতি। অমিয়ভূষণ মজুমদার পিতৃভূমি হিসেবে আবার কর্মসূত্রে বসবাসের সুবাদে এই অঞ্চলের ভাষাকে আয়ত্ত করেছেন। ফলে 'গড়শ্রীখণ্ড', 'নির্বাস' উপন্যাসে এবং 'উরুন্ডী' ও অন্যান্য কিছু ছোট গল্পে এ ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃত পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের শব্দ	প্রকৃত বাংলা শব্দ/অর্থ
হামাক/আমাক	আমার
আছলো	ছিলো
বিরিজ	ব্রিজ

জে	হ্যাঁ
তেনারা	তাহারা
কেডা	কে
ধলিডা	সাদাটা
বদ্যিক	কবিরাজ
কস কি	বল কি
বুন	বোন
ক্ষেতি/কেতি	ক্ষতি
কবো	বলব/বলতে
ট্যাকা	টাকা
দেমাক	বুদ্ধি/রাগ
হবি	হবে
কিছু কলা	কিছু বললে
টেরেন	ট্রেন
র‍্যাল	রেল
খাইছো	খেয়েছো
কনে/কতি	কোথায়
ছওয়াল	বাচ্চা
লাগবি	লাগবে
মনৎ কয়	মনে হয়
কুপি	প্রদীপ
ইস্ত্রি	স্ত্রী/বউ
পতিষ্ঠে	স্থাপন
অমন	এরকম
যতি	যদি/বরং
তীথ	তীর্থ
হিঁদু	হিন্দু
চাঁচাড়ি	ঝুরি

থাকবা	থাকবে
করবা	করবে
বুঝবের	বুঝতে
খানটুক	একটু
ত্যাল	তেল
তোমাক	তোমাকে/আপনাকে
নেচ্চয়	অবশ্য
কুটুম	আত্মীয়
কন/কও	বল/বলা
কবি/কবো	বলবি/বলবো
জাননে	জানি না
গুম	চুপচাপ
মিয়ে ছাওয়াল	মেয়ে বাচ্চা/শিশু কন্যা
ছেইলে	ছেলে
বেহদ্দ	খুব/বেশি
চক্কোত্তি	চক্রবর্তী/ব্রাহ্মণ
আহো	আস/এসো
গোষা	রাগ

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

(ক) আকরগ্রন্থ ঃ—

অমিয়ভূষণ মজুমদার ঃ নয়নতারা, অরুণা প্রকাশনী, কল, ১৯৮৮
ঐ ঃ গড়শ্রীখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কল, ২০০২
ঐ ঃ দুখিয়ার কুঠি, অরুণা প্রকাশনী, কল, ১৯৮৯
ঐ ঃ নির্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৯৯৬
ঐ ঃ মহিষকুড়ার উপকথা, রক্তকরবী, কল, ২০০০
ঐ ঃ রাজনগর, দে'জ পাবলিশিং, কল, ২০০২
ঐ ঃ মধুসাধু খাঁ, সারস্বত, কল, ১৩৭৫
ঐ ঃ চাঁদবেনে, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩
ঐ ঃ বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী, রক্তকরবী, কল, ১৯৯৭
ঐ ঃ বিনদনি, সপ্তাহ, শারদ সংখ্যা, ১৩৯৮
ঐ ঃ মাকচক হরিণ, দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা, ১৩৯৮
ঐ ঃ বিবিক্তা, রক্তকরবী, কল, ১৯৮৯
ঐ ঃ বিলাস বিনয় বন্দনা, অন্বেষা, কল, ১৩৮৯
ঐ ঃ শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৯৯৪
ঐ ঃ ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প, অনুষ্টুপ, কল, ২০০০
ঐ ঃ লিখনে কী ঘটে (প্রবন্ধ সংকলন) আনন্দ পা. প্রা. লি, কল, ১৯৯৬
ঐ ঃ ফ্রাইডে আইল্যান্ড, প্রতিভাস, কল, ১৯৮৮
ঐ ঃ রচনা সমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, কল, ২০০২
ঐ ঃ রচনা সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কল, ২০০৩
ঐ ঃ তাসিলার মেয়র, বারোমাসা, কল, ১৩৮০
ঐ ঃ পঞ্চকন্যা (গল্প সংকলন) বাক্‌শিল্প, কল, জুন-১৯৯০

(খ) বাংলা সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

অশ্রুকুমার সিকদার ঃ আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কল, ১৯৯৩

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৯৯১
ঐঃ বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস, ক্লাসিক প্রেস, কল, ১৩৭৪
অমিয়ভূষণ মজুমদার ঃ উপন্যাসের ভাষা, বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, বসুমতী, শিলিগুড়ি, ১৩৮৮
অরুণ সান্যাল (সম্পা) ঃ প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কল, ১৯৯১
অমলেন্দু সেনগুপ্ত ঃ জোয়ার ভাটার যাট-সত্তর, পাল, কল, ১৯৯৭
অমলেন্দু চক্রবর্তী ঃ অবিরত চেনা মুখ, দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৯৬৪
অরূপ কুমার ভট্টাচার্য ঃ আঞ্চলিকতা ঃ বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কল ১৯৮৭
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ঃ রচনাবলী (দশম খণ্ড), গ্রন্থালয়, কল, ১৯৮৩
অলোক রায় (সম্পা) ঃ সাহিত্য কোষ কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কল, ২০০২
অনিল আচার্য (সম্পা) ঃ সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, কল, ১৯৮২
আমানতুল্লা খান চৌধুরী ঃ কোচবিহারের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ১৯৮৭
আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোঃ, কল, ১৯৭৫
আশিষ কুমার দে ঃ উপন্যাসের শৈলী, প্যাপিরাস, কল, ১৯৮৩
উজজ্বল কুমার মজুমদার ঃ উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, করুণা, কল, ১৯৮৪
কমল কুমার মজুমদার ঃ অন্তর্জলী যাত্রী, কল, ১৪০৪
কমল কুমার সান্যাল ঃ উপন্যাস বীক্ষা, বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার, কল, ১৯৮৪
কার্তিক লাহিড়ী ঃ বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, সারস্বত, কল, ১৯৭৪
ঐ ঃ বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি, সারস্বত, কল ১৩৭৯
ঐ ঃ সৃজনের সমুদ্র মন্থন, অন্বেষা, কল, ১৯৮৪
গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ঃ বাংলা কথা সাহিত্যের প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তক বিপণি, কল, ১৯৯১
ঐ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, কল, ১৯৯৭
জয়ন্ত কুমার ঘোযাল ঃ বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, পুস্তক বিপণি, কল, ১৯৯২
জগমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পা. প্রা. লি, কল. ১৯৯২
জীবনানন্দ দাশের কাব্য গ্রন্থ (প্রথম খণ্ড) ঃকল, ১৩৮৪
জীবনানন্দ দাশ ঃ শ্রেষ্ঠ কাব্য, ভারবি, কল, ১৯৮৮
তপোধীর ভট্টাচার্য ঃ বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি, কল, ১৯৯৬
ঐ ঃ উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কল, ১৯৯৯
ঐ ঃ উপন্যাসের প্রতিবেদন, রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কল, ১৯৯৯

ঐ ঃ ছোট গল্পের অন্তর্ভূবন, মহাজাতি প্রকাশনী, কল, ১৯৯৮
তাপস ভট্টাচার্য ঃ বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, পুস্তক বিপণি, কল, ১৪১১
দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পঃ বঙ্গ রাজ্য পর্যদ, কল, ১৯৮৬
দীলিপ মজুমদার ঃ বাংলা সাহিত্যে প্রগতি চিন্তা, কল, ১৯৯১
ঐ ঃ উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, প্রতিক্ষণ, কল, ১৯৯৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অষ্টাদশ (গল্প সংকলন) সমকাল প্রকাশনী, কল, ১৩৮৬
নাজমা জেসমিন চৌধুরী ঃ বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, চিরায়ত প্রকাশন, কল, ১৯৮০
নির্মল দাস ঃ উত্তর বঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, কল, ১৯৮৬
নীরদ চৌধুরী ঃ বাঙালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ, কল, ১৯৮৬
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র (সম্পা) ঃ নিম্ন বর্গের ইতিহাস, আনন্দ পা. প্রা. লি, কল, ২০০১
প্রমোথ কুমার সান্যাল ঃ হাসুবানু, সাহিত্য সংস্থা সংস্করণ, কল, ১৯৮৭
প্রবোধ নাথ বিশী ঃ বাংলা সাহিত্যে নরনারী, মৈত্রী, কল, ১৯৬৬
বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ঃ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, কল, ১৩৮২
বিজিত কুমার দত্ত ঃ বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ, কল, ১৩৮৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ, কল, ১৪১১
বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পাঠভবন, কল, ১৯৮৬
বিষ্ণু দে ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, কল, ১৯৮৫
মহাশ্বেতা দেবী ঃ আঁধার মানিত, সাহিত্যম্, কল, ১৯৭০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), গ্রন্থালয়, কল, ১৯৮৫
মালিনী ভট্টাচার্য ঃ নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, কল, ১৯৯৬
যশোধরা বাগচী ঃ নারী ও নারীর সমস্যা, অনুষ্টুপ, কল, ২০০২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পগুচ্ছ-১, বিশ্বভারতী, কল, ১৪০৩
রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) ঃ পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৮৫
রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), পঃ বঙ্গ সরকার, ১৯৮৫
রমা প্রসাদ নাগ ঃ স্বতন্ত্র নির্মিতি ঃ অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কল ২০০২
শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, বুক ল্যান্ড, কল, ১৯৯৬
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কল, ১৯৯৬
সত্যান্দ্র নাথ রায় ঃ বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয়, কল, ১৩৯৩

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কল, ১৯৮৮
ঐ ঃ জীবনানন্দ স্মৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কল, ১৯৭১
ঐ ঃ বাংলা উপন্যাসে দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পঃ বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কল, ১৯৩৩
সমীরণ মজুমদার (সম্পা) ঃ উপন্যাস শিল্প, অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৯৭
সুমিতা চক্রবর্তী ঃ উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কল, ১৯৯৮
সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কল, ১৯৮৭
সুবল সামন্ত (সম্পা) ঃ বাংলা উপন্যাসে দীক্ষা ও অদীক্ষা এবং মুশায়েরা, কল, ১৯৯৮
স্বরাজ গুছাইত ঃ বিনির্মাণ ও সৃষ্টি আধুনিক উপন্যাস, অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৯৭
হীরেন চট্টোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য প্রকরণ, বামা, কল, ১৪০৭
ঐ ঃ বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতা ঃ জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী, কল, ১৯৮৩
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উদ্বাস্তু, ১৯৭০

(গ) সহায়ক বাংলা পত্র-পত্রিকা ঃ-

অতিথি ঃ ৩৪ বর্ষ, অক্টোবর-২০০১
অমৃত ঃ নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৭৬
অমৃতলোক ঃ প্রাক্ পূজা সংখ্যা - ২০০১
ঐ ঃ সংখ্যা ৮০, ১৯৯৭
ঐ ঃ সংখ্যা ৮৮, ২০০০
অনুভাব ঃ সেপ্টেম্বর-২০০১
অন্যস্বর ঃ জুলাই-ডিসেম্বর-১৯৮৪
আকাদেমিক পত্রিকা ঃ পঃ বঙ্গ আকাদেমি, মে-২০০০
আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৮ শে মে-১৯৮৫
ঐ ঃ ২৪ জুন-১৯৯৫
আজকাল পত্রিকা ঃ ১৬ ডিসেম্বর-১৯৮৬
ঐ ঃ ৯ মার্চ-১৯৮৬
আলোচনা চক্র ঃ জানুয়ারি-২০০২
উত্তরাধিকার ঃ শারদ-১৯৯৪

ঐ ঃ শারদ-১৯৮৫
উত্তরধ্বনি ঃ শারদ-১৪০৯
উজজ্বল উদ্ধার ঃ সংখ্যা-৩০, সেপ্টেম্বর-২০০১
উদিত ঃ ফেব্রুয়ারি-১৯৮৭
একা এবং কয়েকজন ঃ অক্টোবর-২০০১
একান্তর ঃ অক্টোবর-২০০১
একালের রক্তকরবী ঃ অক্টোবর-২০০১
এবং মুশায়েরা ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৯৬
ঐ ঃ মার্চ-১৯৯৭
কবিতীর্থ ঃ সেপ্টেম্বর-১৯৯৮
ঐ ঃ অক্টোবর-২০০১
কবিতা পাক্ষিক ঃ আগস্ট-২০০১
কবিতা সীমান্ত ঃ অক্টোবর-২০০১
কবিতার কাগজ ঃ অক্টোবর-২০০১
কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা ঃ জুলাই-অক্টোবর-১৯৭৪
কালপুরুষ ঃ অক্টোবর-১৯৭৬
কৌরব ঃ সেপ্টেম্বর-১৯৮৯
খোঁজ ঃ অক্টোবর-২০০১
গল্প মেলা ঃ বার্ষিক সংখ্যা-১৯৯৩
চতুরঙ্গ ঃ আগস্ট-২০০১
ঐ ঃ শ্রাবণ-আশ্বিন-১৪০৮
ঐ ঃ সেপ্টেম্বর-১৯৮৬
ঐ ঃ এপ্রিল-জুন-১৯৮১
জনপদ প্রয়াস ঃ সেপ্টেম্বর-২০০২
জিজ্ঞাসা ঃ শ্রাবণ-১৩৮৭
ঐ ঃ তৃতীয় সংখ্যা-১৪০৩
জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী-১৯৬১
জারি বোবা যুদ্ধ ঃ জানুয়ারি-২০০২

তমসুক ঃ মে-১৯৯১
তরস্বী ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা-২০০৩
দেশ ঃ ৬ নভেম্বর-১৯৯৩
ঐ ঃ ১৯ অক্টোবর-১৯৮৫
দিবারাত্রির কাব্য ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০১
ঐ ঃ উপন্যাস, সংখ্যা-২, ২০০০
ঐ ঃ উপন্যাস, সংখ্যা-৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৩
দৈনিক বসুমতী ঃ ১৯ মার্চ-১৯৯৫
ঐ ঃ শারদ সংখ্যা-১৩৯৮
ঐ ঃ শারদ সংখ্যা-২০০০
নার্বাক ঃ নভেম্বর-১০৮৬
নন্দন ঃ আগস্ট-২০০১
নবলিপি ঃ অক্টোবর-২০০১
নিযাদ ঃ অক্টোবর-১৯৭০
নোনাই ঃ ১৩৯৯
পত্রপুট ঃ শরৎ-হেমন্ত-১৩৯৪
ঐ ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০১
পরিকথা ঃ মে-২০০২
ঐ ঃ মে-২০০০
পরিচয় ঃ শারদীয়-১৪০৮
পথিকৃৎ ঃ প্রথম সংখ্যা-১৯৮৭
পূর্বদেশ ঃ অক্টোবর-২০০১
পূর্বাশা ঃ জৈষ্ঠ্য সংখ্যা-১৩৬০
প্রতিদিন ঃ জুলাই-২০০১
প্রতর্ক ঃ সেপ্টেম্বর-১৯৮৬
প্রবাহ তিস্তা তোরযা ঃ শারদ ১৪০৮
প্রতিক্ষণ ঃ আশ্বিন-১৩৯৪
ঐ ঃ মে-১৯৯৪

ঐ ঃ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৫
প্রমা ঃ চতুর্থ সংখ্যা-১৯৮৬
ঐ ঃ এপ্রিল-জুন-১৯৯২
ঐ ঃ এপ্রিল-জুন-১৯৮৭
বর্তমান ঃ ২৫ জুন-১৯৮৬
বারোমাসা ঃ অক্টোবর-১৩৮০
বিজ্ঞাপন পর্ব ঃ ১০ অক্টোবর ১৯৮২
বিকল্প ঃ ১-২ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৯
ঐ ঃ ৬ সেপ্টেম্বর-২০০১
বৈতানিক ঃ জানুয়ারি-২০০২
মধুপর্ণী ঃ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা-১৩৯৪
মল্লার ঃ জুলাই-২০০১
রক্তকরবী ঃ শারদ সংখ্যা-১৩৯৮
লাল নক্ষত্র ঃ শারদ-১৩৯৩
শিলীন্ধ্র ঃ শারদ-১৪০৮
শিলোঙ্ক ঃ অক্টোবর-২০০১
সপ্তাহ ঃ শারদ-১৩৯৬
সারস্বত ঃ আষাঢ়-১৩৯৫
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ জানুয়ারি-মার্চ-১৯৮৪
হাওয়া-৪৯ ঃ অক্টোবর-১৯৯৯
হীনযান ঃ জানুয়ারি-১৯৮৫
ক্ষুধার্ত ঃ তৃতীয় সংখ্যা-১৯৭৫

(ঘ) ইংরাজি সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

A.S. Hornby with A.P. Chowie (Edited) : Oxford Advance Learner's Dictionary of current English, 1974.
Aziz Ahmed : Islamic Modernism in India and Pakistan (1857-1964), 1984.
Cornelius Ryan : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-15, 1981.
Cornelius Ryan : Refugees : The dynamic of desplacement, 1986.

Cornelius Ryan : Relief and rehabilitation of displaced persons in West Bengal, 1958.
Cornelius Ryan : The Shorter Oxford English Dictionary, 1965.
Cornelius Ryan : The Random House Dictionary Ballantine Books, 1978.
David Lodge : The Language of Fiction, 1966.
Erich Froman : The Sane Society, 1968.
Gabriel Josipobice : Literature and Criticism TLS, 1988.
John Jacob Clayton : Saul below's - in defence of man, 1989.
Monidipa Chatterjee : A broad outline to action programme for the development of refugee colony in C-M-D, 1975.
M. Kennedy : Notes on criminal classes in the Bombay Presidency, 1978.
P.K. Bose (Edited) : Refugees in West Bengal, 1997.
Prafulla Kumar Chakraborty : The Marginal man, 1990.
Priyaranjan Sen : Western Influence in Bengali literature, 1996.
Pranati Choudhuri : Refugee in West Bengal : A study of the growth and distribution of refugee settlements with C.M.D., 1983.
Sayee : Introduction to the Science of Language, Vol-1, 1979.

উদ্বাস্তু শরণার্থী

উদ্বাস্তু শরণার্থী

উদ্বাস্তু শরণার্থী